শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১ কলেজ রো, কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবন, ১৩৬৮

প্রকাশক
কল্যাণব্রত দত্ত
১ কলেজ রো,
কলকাতা-৯

মুদ্রক
ত্রিযাম্পতি দত্ত
সাক্ষর মুদ্রণী
১ কলেজ রো,
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ-শিল্পী
অরুণ বণিক

তিন টাকা

শ্রী সৌম্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর
সুহৃদবরেষু

জানে। বর্তমানে সেই ভাঙা জায়গায় বাঁশের ছোট ছোট ব্যাকারি দিয়ে এমন সুনিপুণভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে যে, ছাগল গরু ত দূরের কথা, একটা ইঁদুর বিড়াল পর্যন্ত সে-পথ দিয়ে পার হতে পারে না।

দরজাটা তখনও খোলা ছিল। শুধু খোলা নয়, চৌকাটের ওপাশে ছোট একটি দড়ির খাটিয়ার ওপর প্রকাণ্ড ভুঁড়িওলা একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান বোধ হয় আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় পাহারা দিচ্ছিল।

গাড়ি থেকে প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক নেমে পড়লো। কালো রং, পরণের ধুতি-চাদর ময়লা, কঙ্কালসার চেহারা। তবে মাথার টেরি আর গোঁফের বাহার বড় চমৎকার। এ রকম গোঁফ বড়-একটা দেখা যায় না—তুটি প্রান্ত সরু হয়ে যেন কানে গিয়ে ঠেকেছে। লোকটা গোঁফের আগাটা এক হাতে পাকাতে পাকাতে অন্য হাত দিয়ে কোচম্যানের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে গাড়ির ভেতর ইংগিত করে বললে, এসো।

গাড়ির পাদানিতে পা দিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটি মেয়ে। আপাদমস্তক সিল্কের চাদরে ঢাকা, খালি পা তুটি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। দেহের গড়ন বড় সুন্দর। শুভ্র, সুকোমল তুখানি পা।

লোকটির পেছনে পেছনে মেয়েটি বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। লোকটি ডাকলে—সিংজী!

বাবুর ডাকার আগেই গাড়ির শব্দে সিংজীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। খাটিয়ার ওপর ধড়মড় করে উঠে বসে, লাঠিটা অন্ধকারে হাতড়ে হাঁকলে—কোন্ হ্যায়!

—আমি দীনবন্ধু।—দীনুবাবু।

সিংজী উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আইয়ে বাবুজী!

সিংজী আগে আগে, আর বাবুজী ও মেয়েটি তার পিছু পিছু সিঁড়ি ধরে দোতলার যে-ঘরে গিয়ে ঢুকলো, সে ঘরখানি চমৎকার ভাবে সাজানো। বাড়ির অন্য কোন ঘরের সঙ্গে তার যেন কোন সাদৃশ্যই নেই। দেওয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড আর্শী, পাশে কাঁচের আলমারিতে

চিনেমাটির পুতুল, প্রসাধন সামগ্রী, দামী কাপড় জামা। দেওয়ালে বড় বড় তস্‌বির, জাপানী চিক, টিপয়ের ওপর আলো জ্বলছে।

মশারী খাটানো। পালঙ্কের ওপর কে যেন শুয়ে। প্রবল বেগে নাক ডাকছে তার।

সিংজী ডাকলে—মা!

নাক ডাকার শব্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। তারপর মশারি দুলিয়ে খাট কাঁপিয়ে যে বিরাট বপুখানি থপ্‌ করে নিচে এসে পড়লো তা যেমন কালো তেমনি কিম্ভূতকিমাকার! চোখ দুটো গোলাকার, বড়, হিংস্র জানোয়ারের মত লাল। চাম্‌ড়া ভেদ করে যেন ঠিকরে পড়তে চায়।

সেই চোখ দিয়ে সে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকদের মুখের পানে তাকালে। বিশেষ করে অবগুণ্ঠিতা মেয়েটির দিকে।

হাতের ইসারায় সিংজীকে বললে—যাও।

তারপর মেয়েটির হাত ধরে তাকে খাটের কাছে টেনে এনে দীনু-বাবুকে উদ্দেশ করে বললে—ভাবছিলাম, তুমি এখনও এলে না কেন। তোমার নামটি কি গো মেয়ে?

সে তার ঘোমটাটা তুলে গায়ে-জড়ানো সিল্কের চাদরটা টেনে খুলে ফেলে দিয়ে বললে—এটা আবার কেন হিন্দুস্থানীদের মত? কই নাম ত বললে না? কি নাম?

মেয়েটি একবার তার মুখের পানে সোজা হয়ে তাকাতে গিয়ে বোধ হয় ভয়েই চোখ নামালে। বললে—আমার নাম, বীণা।

আলোর দিকে মুখখানা এক রকম জোর করেই তুলে ধরে বিয়ের কনের মুখ যেমন করে দেখে ঠিক তেমনি করেই একাগ্রদৃষ্টিতে দেখতে দেখতে মোটা মেয়েটা বললে—বীণা? তা বেশ। ও নামের আর কেউ নেই আমার ঘরে। এক নামের দুটো থাকলে ভারী মুস্কিল হয় দীনু, বুঝলে? একবার বিমলা নামের দুটো এসে পড়লো একসঙ্গে। আমি বললাম, না, বিমলা তোদের কারও হয়ে কাজ নেই। একটার নাকটা ছিল খ্যাঁদা, তার নাম দিলুম খেঁদি। আর একটার ছিল মুড়ো

খ্যাংরার মত ছোট ছোট চুল। বললাম—তোর নাম রইলো খেংরি। ব্যস্, আর কোন গোলমাল হলো না।

মুখ দেখা শেষ হয়েছিল। তাই সে কথাটা শেষ করে দীনুবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগলো।

সে এক ভারি মজার হাসি!

মেয়েটার দাঁতের মাড়ি দুটো অসম্ভব রকম লাল। এতক্ষণ তা দেখতে পাওয়া যায় নি—হাসবার সঙ্গে সঙ্গেই সে দুটো বেরিয়ে পড়লো।

বললে—আমায় কামিনী মাসী বলে ডাকিস্‌নি বাপু, বুঝলি বীণা? হয় মা বলিস্, নয় দিদি বলিস্ বরং সেও ভাল।···দ্যাখো দেখি আমার কেমন আক্কেল, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কইতে লাগলাম। বলি হাঁ দীনু, খাওয়া হয়েছে তোমাদের, না কিছু আনতে পাঠাবো? এ সময় দোকান কি আর খোলা পাবে ছাই, কটা বেজেছে?

দেওয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে কামিনী-মাসী তার মোটা মোটা ঠোঁটদুটো উল্টে বললে—নাঃ, এতক্ষণ সব বন্ধ হয়ে গেছে।

দীনুবাবু একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ে বোধ হয় ঘুমের ঘোরেই চোখ বুঁজে তখন গোঁফ পাকাচ্ছিল। ঘাড় নেড়ে বললে—না, আগে ঘুমোতে হবে, তারপর অন্য কথা।

কামিনী বললে—চল তবে তোমাদের শোবার ব্যবস্থা করে দিই। কথাবার্তা কাল হবে। সেই ভালো।

বীণার হাত ধরে বললে—আয় বীণা, আয়। এসো দীনবন্ধু, এসো।

পাশের দুখানা ঘরের দরজা বন্ধ। তার পরের ঘরখানি খালি। ঘরে আসবাব-পত্র কোথাও কিছু নেই, মেঝের ওপর মাত্র একখানা তক্তাপোষ পাতা। তার উপর একখানা মাদুর ও একটা বালিশ। তাই দেখিয়ে দিয়ে কামিনী লণ্ঠনটা নামিয়ে দিলে। বললে—দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে শোবে দীনু, কাজ কি বাপু, মেয়েটার গায়ে দুটো সোনা-দানা আছে।

কামিনী চলে যাওয়া মাত্র দীনবন্ধু দরজাটা বন্ধ করে হেঁট হয়ে জুতোর ফিতে খুলতে লাগলো। তারপর গায়ের জামা আর চাদর খানা বেশ করে জড়িয়ে জড়িয়ে বালিশের নীচে রেখে তক্তাপোষের ওপর সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। বীণার দিকে একবার তাকিয়ে বললে—শো এইখানে। রাত হয়েছে।

বীণার বুকের ভেতরটা ছুরছুর করছিল। সে চুপ করে বসে রইলো।

মিনিট-ছুই-তিন পরে দীনবন্ধু চোখ চেয়ে দেখলে, বীণা তখনও বসে আছে। জিজ্ঞাসা করলে—বসে রইলি যে?

বীণা জবাব দিলে না।

দীনবন্ধু বললে—রাত জেগে এসেছিস্, ঘুম পায়নি?

বীণা ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ কি না বললে বোঝা গেল না। দীনবন্ধু উপুড় হয়ে শুয়ে বললে—দে তবে পিঠে সুড়-সুড়ি দে।

কিছুক্ষণ শুয়ে রইলো সে। বীণা নড়েও না, সুড়সুড়িও দেয় না। দীনবন্ধু চোখ বুঁজেই বীণার হাত খানা চেপে ধরে বললে—কি, হলো কি তোর?

এতক্ষণে বীণা কথা বললে। বললে—জল পাওয়া যায় না? এক গ্লাস জল খাব।

—না, জল পাবি না। এখন ঘুমো, সকালে খাস্।

খানিক পরে টস্ টস্ করে ছুফোঁটা গরম চোখের জল দীনবন্ধুর হাতের উপরে পড়তেই সে চম্‌কে চোখ চাইলে। ঘরের আলো তখনও জ্বলছিল। দেখলে বীণা কাঁদছে। বললে—এ আবার কি ঢং? কান্না কিসের?

বীণা নিরুত্তর।

—কাঁদছিস কেন? এই! বলে দীনবন্ধু তাকে এক ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—জল খাবি?

বীণা ঘাড় নেড়ে বললে—না। কিন্তু এ তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এলে? এ-তো ভাল জায়গা নয়।

ভাল জায়গা নয়—মানে ?

কথাটার জবাব দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হলো না। আবার তার চোখ বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

দীনবন্ধু বললে—ঢং রাখ, এ সব আমার ভাল লাগে না। ঘুমো।

বীণা ঘুমোলো না, কথাও বললে না। বসে বসে শুধু কাঁদতে লাগলো।

কেউ যদি পাশে বসে কাঁদে ত মানুষের ঘুমোনো একটুখানি শক্ত। দীনবন্ধু প্রথমে তাকে খুব খানিকটা তিরস্কার করলে। তারপর বোঝাতে লাগলো—তোকে সঙ্গে নিয়ে ভদ্রলোকের বাড়ি ত ওঠা যায় না। কি বলে পরিচয় দেবো ! আর এই কামিনী বাড়িউলী খুব ভাল লোক। মাগীর মেলা টাকা। তুই একটু খোসামোদ-টোসা-মোদ করিস। বুঝলি ?

বীণার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠলো। বললে—না, আমি এখানে থাকবো না। কালিঘাটের কালী দেখাবো, গঙ্গায় চান করাবো বলে তুমি আমায় নিয়ে এলে ভুলিয়ে। তা যদি না করবে ত, কাল রাস্তায় যা বললে তাই করো। না আমি এখানে থাকবো না। আমি শুনেছি। বলে সে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

দীনবন্ধু হাসলে। বললে—দাঁড়া পাগলি। রাস্তায় যা বললাম, তা হলে তুই খুশী ? আচ্ছা তাই হবে। কিন্তু সে কি সহজ কথা ? তুই বিধবা, সুন্দরী—কল্‌কেতা শহর। তোকে বিয়ে-থা করে আলাদা ঘরকন্না করব আর পুলিশ যদি টের পায় ত ক্যাক্ করে ধরবে। ধরে হাতকড়ি দিয়ে একদম কয়েদ। বিয়ে করব বলে যখন নিয়ে এলাম বিয়ে করব বই-কি ! আলাদা বাড়ি-ভাড়া করে চুপি চুপি—দাঁড়া টাকাকড়িরও ত জোগাড়-যন্ত্র করতে হবে।

বীণা বললে—আমার গয়না রয়েছে, টাকা রয়েছে, তাই দিয়ে এখন চালাও। তারপরে না হয় দিও। এখানে আর কিছুতেই থাকবো না দীনুদা—তোমার পায়ে পড়ি।

দীনবন্ধুর ঘুম যেন সহসা ছুটে গেল।

বললে, হ্যাঁ, তাও বটে। আর গয়না-গাঁটি···টাকাকড়ি···নিজের সঙ্গে রাখা···শুন্‌লি ত' বাড়িউলী কি বলে গেল ?

বীণা তৎক্ষণাৎ তার হাতের চুড়ি আর গলার হার খুলে ফেললে। পেট-আঁচলে-গোঁজা রুমাল-বাঁধা দশ টাকার এগারো বারো খানি নোট আর কিছু খুচরো সোনা বের করে এক সঙ্গে সবগুলি বেঁধে দীনবন্ধুর হাতের মুঠোয় ধরিয়ে দিয়ে বললে—রাখো তোমার কাছে।

—আমার কাছে? বলে দীনবন্ধু একবার ইতস্তত করবার ভান করে বললে—আচ্ছা দে।

রাতে তার ভাল ঘুম হয়েছিল কিনা কে জানে, বীণা কিন্তু সারা রাত দু-চোখের পাতা এক করতে পারে নি।

সকালে ঘুম ভাঙলে দীনবন্ধু উঠে বসলো। বাইরে যাবার জন্যে দরজার কাছে একবার এগিয়ে যেতেই বীণা বললে—খুলবে না। আমি দেখেছি। বাইরে থেকে কে যেন শেকল টেনে দিয়েছে।

॥ দুই ॥

দিন-কয়েক পরে।

বীণাকে নিয়ে বাড়িউলী কামিনী বড় বিপদে পড়্‌লো। বললে কথা শোনে না—এমন বেয়াড়া মেয়ে সে জীবনে দেখেনি।

কামিনী বললে—দীন্ত আর আসবে না, সে তার প্রাপ্য গণ্ডা চুকিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

বীণা কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে চায় না।

বলে—না, দীনুদা আমাদের গ্রামের লোক। তার সঙ্গে ভাব তার অনেক দিনের। তা ছাড়া তার গয়না-গাঁটি টাকাকড়ি সবই সে নিয়ে গেছে। সুতরাং সে আসবেই।

কামিনী তবু যখন তার ওপর অত্যাচার করতে থাকে, তখন সে

তাকে আড়ালে ডেকে চুপি চুপি বলে—দীনুদা কিছু বদ-মতলবে আমায় নিয়ে আসেনি। দীনুদা বেরাহ্ম হয়ে আমায় বিয়ে করবে।

কামিনীর হাসি যেন আর ধরে না। তেমনি ঘোড়ার মত মাড়ি বের করে ঢলে ঢলে এমন অট্টহাসি হাসতে থাকে যে, মনে হয় ভাঙা বাড়ি খানি হাসির চোটে বুঝি তার ঘাড়েই পড়ে যাবে।

বেচারী বীণা লজ্জায় অপ্রস্তুতের একশেষ। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, জীবনে এমন কথা আর কখনও বলবে না।

বলবার প্রয়োজনও আর হয় না। মেয়েদের নিয়ে কামিনীর কারবার বহু দিনের। সুতরাং কেমন করে তাদের বশ মানাতে হয় কামিনী তা জানে।

মনে মনেই বলে—হাতী ঘোড়া গেল তল, ব্যাং বলে কত জল! তুই তো কোন্ ছার।

বীণার আদর যত্নের সীমা নেই। রাত্রে কামিনী বলে—আয়, তুই আমার কাছে শুবি আয়।

সে তার নিজের বিছানার পাশে বীণাকে শুতে বলে এ-কথা সে-কথার পর দীনবন্ধুর কথা তোলে। বলে—দীনু পয়সা রোজগার মন্দ করে না। তবে জানিস্ কি বীণা, ও পয়সা বেশিদিন থাকে না।

দীনুদা তাদের গ্রামের লোক। কিন্তু গ্রামে তার মাত্র একখানি মাটির ঘর ছাড়া আর বিশেষ কিছুই নাই। ছেলেবেলা থেকেই দীনুদা বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়ায়। গ্রামে যদি যায় ত সে কদাচিৎ। তবে যায় যখন, তখন একেবারে সাজ-পোষাক থেকে আরম্ভ করে সেণ্টের গন্ধে এবং টাকার ঝম্‌ঝমানিতে গ্রামের লোকের একেবারে চমক লাগিয়ে দেয়। কিসের যে এত রোজগার তা সে জানে না। জিজ্ঞাসা করে—কিসের পয়সা দিদি?

কামিনী হেসে বলে—বুঝতে পারছিস্ না? তুই বড় হাঁদা মেয়ে দেখছি।

বীণা চুপ করে থাকে।

কামিনী বলে—মেয়ে চালানি ব্যবসা। আমাকে দিয়েছিল পাঁচটা, পাঁচটাই মরেছে। একটাও ভাল নয়। ওকে টাকা যা দিয়েছি তাতে আমার বিশেষ কিছু হয়নি। তাই অনেকদিন থেকেই বলছিল—দেবো এনে দিদি, একটি বড় খাসা মেয়ে আছে আমাদের গাঁয়ে। তোর কথাই বলেছিল আর-কি!

এই পর্যন্ত বলে কামিনী একবার বীণার মুখের দিকে তাকিয়ে তার ভাব-গতিক লক্ষ্য করলে। দেখলে, বীণার মুখখানা অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে উঠেছে। তখন সে তার চিবুকে হাত দিয়ে মুখখানা একবার নেড়ে দিয়ে বললে—ভাবছিস্ কি লা? তোকে বিয়ে করবে বলেছিল? হ্যাঁ, ও মুখ-পোড়া বিয়ে করবে না আরও-কিছু! আমার কাছে নগদ একশটি টাকা গুণে নিয়ে এই যে চলে গেল—এখন কতদিন যে আর এ-মুখো হবে না তার ঠিক নেই।

বীণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—আসবে না? সত্যি আর আসবে না দীনুদা?

কামিনী বললে—ক্ষেপেছিস?

—আমার গয়না, টাকা···সবই যে তাহলে নিয়ে গেল দিদি। বলে সজল চোখে বীণা একবার কামিনীর মুখের দিকে তাকালে।

কামিনী সে-কথা সত্যিই জানতো না। হাতের চুড়ি কয়গাছা দেখতে না পেয়ে ভেবেছিল, হয়ত সে নিজেই খুলে রেখেছে। চোখ দুটো হঠাৎ তার অত্যন্ত বড় হয়ে উঠলো। বীণার হাতখানা নেড়ে চেড়ে দেখে বললে—ওমা! সত্যি নাকি? সেদিন তুই বললি বটে, কিন্তু আমার তখন বিশ্বাস হয় নি। এই যাঃ, তবে আর তোকে হাঁদা মেয়ে বললুম কেন?

গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কামিনী বললে—যাক্‌গে, মনে তুই দুঃখু করিসনে বীণা। আমি তোকে চুড়ি গড়িয়ে দেবো। ওই হতভাগাকে তুই আবার চাইছিলি বিয়ে করতে! মরণ আর-কি! বিয়ে করতে চাস, আমি তোর সে ব্যবস্থা করে দেবো বীণা, ভাবিসনে।

তার গায়ে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিতে দিতে সে নিজেও এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো।

কিন্তু বীণার চোখে ঘুম নেই। যে-পুরুষ তাকে এম্‌নি করে ভুলিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে এলো, ভগবান কি কখনো তার ভাল করবে? তা না করুক, কিন্তু তার কি হবে? বীণা তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ভেবে ভেবে কূল-কিনারা কিছু পেলে না। নিতান্ত নিরুপায় তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভেবে সেই নিরালোক নিস্তব্ধ ঘরের শয্যাপ্রান্তে মেয়েটা শুধ্‌ কেঁদে কেঁদে সারা হলো।

মেয়ে সেখানে একটি নয়, দুটি নয়—কুড়িটি।

পাশাপাশি ঘর। সুমুখে একটা রেলিং-দেওয়া চওড়া বারান্দা।

মেয়েদের নিজেদের কাজ-কর্ম বিশেষ কিছুই করতে হয় না। কামিনীর ভারী চমৎকার বন্দোবস্ত। খুব ভোরে তারা ঘুম থেকে ওঠে। যারা না ওঠে সিংজী তাদের লাঠির গুঁতো দিয়ে উঠিয়ে দেয়।

নিচের অন্ধকার স্যাঁত-সেঁতে উঠোনের ওপর লম্বালম্বি প্রকাণ্ড দুটো চৌবাচ্চা। বাইরের লোকের হঠাৎ নজরে না পড়ে তাই টিন দিয়ে ঘেরা। সেইখানে কাপড় কেচে মুখ-হাত ধুয়ে মেয়েরা ওপরে উঠে আসতে-না-আসতেই দেখে, প্রতিদিনের নিয়ম মত চা আর এক-বাটি করে মুড়ি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে এর মধ্যেই রেখে দেওয়া হয়েছে।

কাচা কাপড়গুলো রেলিংএর ওপর মেলে দিয়ে এবার তাদের প্রত্যেককেই ময়লা কাপড় পরতে হয়। সকলেরই ঠিক এক রকমের কাপড়।

চা খেতে না খেতেই দেখে নিচের একটা প্রকাণ্ড গুদোম ঘর থেকে কাতারে কাতারে টিনের বাক্স এনে উপরের বারান্দায় সার সার সাজানো হচ্ছে। কুড়িটি কামরার সুমুখে কুড়ি থাক বাক্স। এক একটি কাঠের পিঁড়ি আর তার পাশেই রঙের কৌটো। মোটা মোটা তুলি আর হাত মোছবার জন্যে পাটের নুড়ি।

কখনও কামিনী কখনও সিংজী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজের তদ্বির

করে। কোথাও এতটুকু ভুলটুল হবার উপায় নেই। সিংজী পারে না, কিন্তু কোনও আনাড়ি মেয়ে যদি কোনদিন রঙের তুলি ধরে বাক্সের ওপর ভাল চালাতে না পারে, কামিনী তক্ষুণি তার হাত থেকে তুলি কেড়ে নিয়ে, কেমন করে বাক্স রঙ করতে হয় তা নিজের হাতে দেখিয়ে দেয়। দেখিয়ে দেয় চোখে আঙুল দিয়ে।

চোখে আঙুল হয়ত সে সত্যিই দেয় না, কিন্তু রঙ-মাখানো হাতের দুটি ধারালো নখ-ওয়ালা আঙুল দিয়ে সেই আনাড়ি মেয়েটির গালে সজোরে একটি চিম্‌টি কেটে দেয়।

যন্ত্রণায় চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে, তবু কিছু বলবার উপায় নাই। ভাবে, ওর চেয়ে বোধ হয় চোখে আঙুল দেওয়াও অনেক ভাল।

তবে কামিনী নিজে পাকা মেয়ে। যে বাক্সটা সে নিজের হাতে রঙ করে দেখিয়ে দেয়, তা সত্যিই দুদণ্ড চেয়ে দেখবার মতো। কিন্তু ও কাজ সে কোথায় শিখেছে তার ইতিহাস কেউ জানে না।

একটার পর একটা বাক্স রঙ করা চলতে থাকে।

শেষ হওয়ামাত্রই সেটাকে সযত্নে দুই হাত দিয়ে তুলে ধরে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে রেখে আসতে হয়।

শুকোবার জন্যে ছাদে নিয়ে গিয়ে কেউ একটুখানি কোমরে হাত দিয়ে পায়চারী করে কোমরের ব্যথা সারাবে তার উপায় নাই। একটুখানি দেরী হয়েছে কি তক্ষুণি পেছনে পেছনে সিংজী গিয়ে হাজির।

এম্‌নি কড়া পাহারা!

তার মধ্যেই বেশ সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ চলতে থাকে।

বেলা ঠিক একটার সময় খাবার ছুটি।

তার আগেই উড়ে রাঁধুনী বামুন পৈতের গোছা দুলিয়ে কানা-উঁচু কলাই-করা থালায় ভাত তরকারী ঘরে ঘরে ধরে দিয়ে যায়। মেয়েদের আর নিচে নেমে যেতে হয় না।

দোতলার বারান্দার এক কোণে দুটি জলের বাল্‌তি বসানো।

পাশেই একটা কাপড় কাচা সাবান।

মেয়েরা একে একে উঠে গিয়ে হাতে সাবান ঘষে একটা বালতির জলে হাত ডুবিয়ে সাবানটা ধুয়ে ফেলে। তারপর পাশেই আর একটি বালতির পরিষ্কার জলে হাত ধুয়ে আপন আপন ঘরে গিয়ে খেতে বসে। কাজ একেবারে সব ঘড়ি-ধরা।

প্রায় তুটোর সময় খাওয়ার হাঙ্গামা চুকিয়ে দিয়ে আবার তাদের কাজে বসতে হয়।

কাজ শেষ হয় পাঁচটায়।

কাজ শেষ হওয়ামাত্র মেয়েরা চুল বাঁধতে বসে।

কামিনী এইবার প্রত্যেকের ঘরে ঘরে নিজে গিয়ে এক টুকরো সানলাইট সাবান আর একখানি করে কাচা শাড়ি দিয়ে আসে।

সারা দিনরাতের মধ্যে এইটুকুই তাদের আনন্দের সময়।

কুড়ি জন মেয়ে হল্লা করতে করতে নিচে নেমে যায়, সাবান দিয়ে গা ঘষে স্নান করে, স্নান করে পরিষ্কার শাড়ি পরে উপরে উঠে আসে।

কামিনী সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সকলকেই একবার বেশ ভাল করে দেখে নেয়। তারপর প্রত্যেকের হাতে এক গাছি করে কেমি-কেলের চুড়ি পরিয়ে দিয়ে বলে—কেউ যদি কোনও রকম গোলমাল করেছ কি—ব্যাস!

আর কিছু বলার প্রয়োজন হয় না। মেয়েরা আপন আপন ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে। কেউ-বা শুয়ে পড়ে একটু গড়িয়ে নেয়।

কিন্তু বীণার উপর করুণা কামিনীর একটু বেশি।

বাক্স তাকে রং করতে হয় না, কামিনী তাকে প্রায় অধিকাংশ সময় কাছে কাছে রাখে। একসঙ্গে খায়, এক বিছানায় শুয়ে গল্প করে।

অন্যান্য মেয়েদের হিংসা হয়।

বীণার আদর যত্ন দেখে তারা যেন জ্বলে পুড়ে মরে। কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না, কিন্তু তাদের পাশ দিয়ে যদি সে কোনও দিন একলা হেঁটে যায়, মেয়েরা কেউ নাক সিঁটকায়, কেউ-বা হ্যাক্ থু

বলে খানিকটা থুথু ফেলে বলে—রূপের দেমাগ্ থাকে না লা, অত দেমাগ্ করিস্‌নে। আমাদেরও একদিন ছিল।

অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যবতী একটি মেয়ে প্রতিবাদ করে—ছ্যালো কি লা, ছ্যালো কি! ওর ওই শুঁটকি শুঁটকি গড়নের চেয়ে আমাদের সরস্বতীর গড়ন ঢের ভালো।

সরস্বতীর তখন আর মাটিতে পা পড়ে না। মোটা মোটা থপ-থপে দেহ নিয়ে সে হেলেদুলে তাদের কাছে এসে দাঁড়ায়। হাত মুখ নেড়ে বলে—চেহারার কথা বল্‌ছিস্ ভাই? আ, ওই আবার গড়ন নাকি? গড়ন ছিল আমার দিদির। আমাদের গুষ্টিটাই এমনি।

যাই হোক, বীণার কাছে আজকাল নিন্দা প্রশংসার আর কোন দাম নেই। দিনরাত সে মুখ ভার করে ঘুরে বেড়ায়। যতই সন্ধ্যা হয়ে আসে, ততই তার বুকের ভেতর যেন ঢিপ্ ঢিপ্ করতে থাকে।

কত রকমের কত লোককে যে কামিনী ধরে আনে তার আর ইয়ত্তা নাই। বলে—রোজ ত এনে দিচ্ছি। এবার যাকে খুশী একটা বেছে টেছে নে বাছা। আমি আর পারি না।

কিন্তু বেছে নেওয়া দূরে থাক, বীণা তাদের প্রত্যেককে যা-তা বলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়।

কেউ বকে-ঝকে অভিমান করে মেয়ে-জাতটাকে গালাগাল দিতে দিতে চলে যায়। আবার কেউ-বা কামিনীর কাছে এসে তার টাকা ফেরত চেয়ে বসে।

প্রথম প্রথম কামিনী তাও দিয়েছে।

এক আধ টাকা কেটে বাকি টাকা ফেরত দিতে সে কসুর করে নি। বলেছে—আপনি রাগ করে যেন আবার আসা বন্ধ করবেন না। আবার আসবেন, আমি ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে—

কিন্তু যে বোঝে না, তাকে বোঝানো অসম্ভব।

বীণা বলে—তাহলে দিদি আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

কামিনী হাসে। বলে—একেবারে হাঁদা মেয়ে! বাড়ি যাবি

কি লা? বেরিয়ে এসেছিস্, বাড়ি ঢুকবি কোন্ মুখে? খ্যাংরা মেরে যে আবার দূর করে দেবে লা। তখন কি করবি?

বীণা হেঁট মুখে কি যেন ভেবে বলে—কালীঘাটের কালী দেখতে দীনুদা আমায় নিয়ে এসেছে। আমি বাড়ি যাব।

কামিনীকে এইবার নিজ মূর্তি ধারণ করতে হয়। চোখ রাঙিয়ে বলে—বাড়ি যাবি কি রকম? আমার টাকা কে দেবে? যাব অম্‌নি বললেই হলো—না কী!

বীণা আর ভয়ে কিছু বলতে পারে না। চুপ করে থাকে সে।

॥ তিন ॥

লোকজন সব বীণার কাছেই যেতে চায়, কিন্তু কামিনীর দাঁও মিটিয়ে সেখানে যাওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না।

সেদিন এলো এক বড়লোকের ছেলে।

দিব্যি গোলগাল চেহারা, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, পরণে শান্তি-পুরের ধুতি, পায়ে পাম-সু, স্নো পাউডারে মুখখানি সাদা। গলায় আর হাতে কয়েক গাছা বেলফুলের মালা। সঙ্গে দুজন ইয়ার বন্ধু।

কামিনীর দরজায় ট্যাক্সি থেকে নেমে সিঁড়ির ওপর দিয়ে টলতে টলতে পড়তে পড়তে ওপরে এসে হাজির। ডাকলে—মাসি, বলি অ মাসি! আছো?

আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কামিনী চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করে তাকে নিজের ঘরের ভেতর এনে চেয়ারে বসতে বললে।

বন্ধু দুজনকে কিছু বলতে হলো না। তারা আপনা হতেই ঠিক যেন কলের পুতুলের মতই পাশাপাশি দুইজনে দুটি চেয়ারে বসে পড়লো।

কামিনী হেসে বললে—আজ হঠাৎ এতদিন পরে ?

ছোকরাটি হেসে বললে—মনে আছে তাহলে দেখছি। আচ্ছা মাসি, আমার নাম কি বল দেখি, তাহলে জানবো—

বন্ধু একজন হো হো করে হেসে উঠল, আর একজন চেয়ারের হাতলে বার-কতক ঘা মেরে বললে—হিয়ার ইউ আর।

কামিনী সত্যিই বিপদে পড়েছিল।

ছোকরা যে একবার এসেছিল সে কথা তার মনে আছে, তবে কত লোক যাওয়া আসা করে। অত নাম মনে রাখতে গেলে চলে না, আর—মনে থাকেও না।

কামিনী পানের বাটা নিয়ে সাজতে বসে হেসে হেসে বললে—আচ্ছা সে সব পরে হবে, আগে পান খান।

একজন বন্ধু বলে উঠল—নো পান। আগে কথা বার্তা দেখা শোনা হোক্, না-হয় আমরা উঠি—কি বল্ রাসু ?

ছোকরাটি তখন তার পকেট থেকে সিগারেট বের করে মুখে দিয়ে অনেক কষ্টে দিয়াশালাই জ্বেলে সেটা ধরাতে পারছিল না। ঘাড় নেড়ে অস্পষ্ট ইংরাজীতে কি যেন বললে।

—বেশত! বলে কামিনী সেইখানে বসে বসেই ডাকলে—বীণা, অ-বীণা!

বীণা তার ঘর থেকে বাইরে এসে বললে—যাই!

যাই বলে সে কামিনীর দরজার কাছে এসেই ভেতরে এতগুলি লোক দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লো।

কামিনী ডাকলে—আয় ভেতরে আয়।

বীণা দরজার চৌকাট ধরে নতমস্তকে দাঁড়িয়েই রইলো। ঘরের আলো পড়েছে তার গায়ে, মুখে।

বাবুটির নাম রাসবিহারী, ওরফে রাসু। সে সোঁ সোঁ করে সিগারেটে দুটো টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বীণার দিকে তাকিয়ে কোনও প্রকারেই আর চোখ ফেরাতে পারলে না। হাতের সিগারেট হাতেই পুড়তে লাগলো।

কামিনী একটু রুক্ষস্বরে বললে—আয় লা, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

ভেতরে যাবার অর্থ বীণা জানে। সে তার আয়ত চোখদুটি তুলে কামিনীর দিকে অত্যন্ত করুণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে।

কিন্তু কামিনী তার সে মিনতির ভাষা বুঝলো না। সে উঠে গিয়ে থপ্ থপ্ করে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বীণার একখানা হাত ধরে আচম্‌কা এক টানে তাকে ঘরের মধ্যে এনে ফেললে। তারপরই বাঁ হাত দিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তার বাইরে বের হবার পথও বন্ধ করে দিলে।

রাসবিহারী তখন একাগ্র মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

কামিনী হেসে বললে—বড় বেয়াড়া মেয়ে। সবে দেশ থেকে এসেছে কিনা।

বলে নিজের হাতে বীণার মুখখানা আলোর দিকে তুলে ধরে নিজেও সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলো।

রাসবিহারীর সঙ্গী দুজনের একজন তখন ঢুল্‌ছে, অন্য জন কামিনীর বাটায় বসে পান সাজতে সুরু করে দিয়েছে।

রাসু এতক্ষণ পরে ঘাড় নেড়ে হেসে বললে, ঠিক! এবারে মাসিকে আমি বকশীশ্ দেবো।

তার হাতে-জড়ানো গোড়ের মালাগুলি খুলে সে উঠে দাঁড়ালো। সর্ব প্রথম এক গাছি মালা মাসির গলায় পরিয়ে বাকী কয়গাছা এক-সঙ্গে বীণার গলায় পরিয়ে দিয়ে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ভাল করে তাকে একবার দেখে বললে, বলি এত লজ্জা কেন গো বীণা, এসো।

এই বলে সে তার হাতে ধরে চড় চড় করে টেনে এনে একেবারে কামিনীর খাটের ওপর নিজেও বসলো, তাকেও বসালো।

কামিনী এগিয়ে এসে বললে—থামো বাছা, আগে পান-টান খাও, দেনা-পাওনা চুকুক।

সে হাত বাড়িয়ে বীণাকে সেখান থেকে উঠে আসবার ইংগিত করতেই রাসবিহারী পকেট থেকে তার মণিব্যাগ বের করলে।

দশ টাকার একখানা নোট কামিনীর সেই প্রসারিত হাতের ওপর গুঁজে দিয়ে বললে—হলো ত?

নোটখানি কামিনী আবার তার গায়ের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললে—পাগল হলে নাকি? দশ কি হবে? পঞ্চাশের এক পয়সা কম নয়।

রাসু এক রকম শুয়ে পড়েছিল। বীণার মুখের পানে একবার সে ভাল করে তাকিয়ে দেখলে, তারপর হাসতে হাসতে উঠে বসলো। মণিব্যাগ খুলে এবারে আর না গুণে আট-দশখানি নোট মাসীর হাতে তুলে দিয়ে বললে—হলো?

কামিনী অবাক!

আনন্দে তার মুখখানা আরও কিম্ভুত হয়ে উঠল। নোটগুলি আঁচলের খুঁটে বেঁধে বললে—বীণা, তোর ভাগ্যি ভাল রে! দেখেছিস্ কেমন ঘরের ছেলে। আজ যদি বাঁদ্‌রামো করিস্ ত তোকে আমি খুন করে ফেলবো। কথাটা যেন মনে থাকে।

কামিনী চলে গেলে যে-লোকটা পান সাজছিল সে পড়ি-কি মরি করে ছুটে এসে বললে—হাউ মাচ্ গিভ? ইউ নট্ কাউন্ট?

রাসু তার হাতখানা টেনে নামিয়ে দিয়ে বললে—নো!

লোকটা ছাড়বার পাত্র নয়। একটু রাগত ভঙ্গিতে বললে—হোয়েন্ এভার আই এ্যাড্‌ভাইস্, দেন এণ্ড দেয়ার ইউ নো—নো—নো। গুড্ ফ্যামেলি ইউ গেট্ আর ব্যস্! মাথার ডাজ নট্ ঠিক! আশ্চর্য!

রাসু জবাব দিলে না। জবাব দেবার অবসর তার ছিল না। সে তখন বীণাকে তার কোলের কাছে টেনে এনে সেই সুন্দর মুখখানির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

একটু পরে কামিনী এসে বললে—তোমরা কি আমার ঘরেই থাকবে?

রাস্থু বললে—হ্যাঁ। একটা ত মদে বেঘোর। আর ওটাকে অন্য কোন ঘরে বসিয়ে দিয়ে এসো, যা লাগে আমি দেবো।

কামিনী তখন তার সঙ্গীটিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কত সাধ্য-সাধনা, কত সোহাগের পর বীণা কথা বললে।

লজ্জায় সে তখন একেবারে ঘেমে ভিজে উঠেছে।

রাস্থু একা-একা কতক্ষণ ধরে যে কথা বলেছিল তার ঠিক নেই। অবশেষে মনে মনে এক রকম বিরক্ত হয়েই সে বললে—বেশ! কথা ত কইলে না, তাহলে আমি চলে যাই, অতগুলো টাকা আমার জলে পড়ুক!

সত্যিই সে উঠে বসতে যাবে, বীণা খপ্ করে তার জামাটা টেনে ধরলে।

রাস্থুর যাওয়া আর হলো না। ফিরে আবার তেমনি করে শুয়ে বললে—কী, কথা কইছ না যে?

বীণা অত্যন্ত ধীরে ভয়ে ভয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে—কি কথা বলব?

রাস্থু খুশী হয়ে বললে—এই ত চাই! আহা, তুমি বড় ভালো মেয়ে। আমার বড় ভাল লেগেছে।

বীণা চোখ দুটি বড় বড় করে তাকিয়ে রইল।

চমৎকার মিষ্টি হাসি তার ঠোঁটে।

রাস্থু বললে—চুল বাঁধোনি যে?

বীণা হাসতে হাসতেই বললে—শুকোয় নি, আজ চান করেছি।

তারপর দুজনেই চুপ।

বীণাই তারপর প্রথমে কথা বললে। একটা ঢোঁক গিলে বার কতক তার মুখের পানে চেয়ে বললে—তুমি বিয়ে করেছ?

রাস্থু একটু ইতস্তত করে বললে—না।

বীণা হেসে বললে—না কি বলছ? অনেক বয়েস তোমার, এখনও বিয়ে হয় নি? ধেৎ, মিছে কথা।

রাসু বললে—না, মিছে কথা নয় বীণা। আচ্ছা বীণা, তোমার বিয়ে হয়েছিল?

লজ্জায় মুখ লুকিয়ে ঘাড় নেড়ে বীণা বললে—হুঁ।

—তবে তুমি স্বামী ছেড়ে পালিয়ে এলে কেন?

—বারে! সে ক—বে মরে গেছে। আমি তখন খুব ছোট। বিয়ের ছ মাস পরেই। তাকে আমার মনেও নেই।

তার কথা বলার ভঙ্গিটি রাসুর খুব ভাল লাগলো। তাকে আদর করে আরও কাছে টেনে এনে বললে— তাহলে তুমি এখানে এলে কেমন করে? কেন এলে? কার সঙ্গে এলে?

বীণা তখন তার জীবনের বৃত্তান্ত বলতে লাগলো।

বললে—ওই দীনুদাই আমার জীবনের কাল। দাদার কাছে ছিলাম, স্বামী মরে যাবার পর থেকে। দীনুদা ছিল দাদার বন্ধু। আমাকে কত ভাল ভাল কথা বলতো। ভালবাসতো। দাদার সঙ্গে ছিপ্ নিয়ে মাছ ধরে বেড়াত। কিছুদিন পরে দাদা হঠাৎ কঠিন অসুখে ভুগে মারা গেল। বৌদি ত অনেক আগেই মারা গেছে। আমি একাই কোনও মতে বাস করছিলাম গাঁয়ে। দীনুদা গিয়ে বললে, চল্ কলকাতা বেড়িয়ে আসি। তারপর বললে, কলকাতায় গিয়ে বিয়ে করব। তারপর এসে দেখি, এই ত তার কাণ্ড।

বীণা বললে—এমন জানলে কিছুতেই আসতুম না।

—কেন?

—দীনুদা পালিয়েছে।

বলে সে তার হাতখানা তুলে দেখালে—এই দেখ, আমার চুড়ি, গয়না, টাকা, সব নিয়ে, আমাকে পর্যন্ত বিক্রী করে দিয়ে পালিয়েছে। দিদি বলছে, সে নাকি আর আসবে না।

রাসু বললে—দিদি কে?

বীণা তার ঠোঁটে এক প্রকার শব্দ করে বললে—দিদিগো, ওই যে, তুমি যাকে মাসি বলছিলে—ওই কামিনী-বাড়িউলি—আমি ওকে দিদি বলি।

রাসু বললে—বেশ, তাহলে তুমি এখন কি করবে ভেবেছ ?

—আমি ? বলে বীণা চোখ বড় বড় করে ঢোঁক গিললে।

—যাবে আমার সঙ্গে ?

কথাটা বীণা যেন বিশ্বাস করতে পারলে না। বললে—নিয়ে যাবে ? সত্যি ? বল—আমার গায়ে হাত দিয়ে—না মাথায় হাত দিয়ে। মাথায় ভগবান থাকে—বল, তিন সত্যি কর। কাল নিয়ে যাবে ?

রাসু বড় বিপদে পড়ল। দেখলে, কথাটা বলা তার ঠিক হয়নি। বললে—আচ্ছা, দাঁড়াও, দেখি দিন-কতক পরে—

বলেই কথাটা পাল্টে নেবার জন্যে বললে—তুমি সিগারেট খাও না বীণা ?

বলে সে নিজে একটা সিগারেট ধরালে। তারপর বীণার উত্তর না শুনেই বললে—খাবে একদিন। এখানে থাকতে থাকতে শিখে যাবে। সিগ্রেট খাবে, বিড়ি খাবে, বিয়ার খাবে—তারপর হুইস্কি, ব্রাণ্ডি থেকে দিশি মদ পর্যন্ত—

বীণা বিস্মিত হয়ে বললে—বা, এখানে থাকব কেন ? এই যে তুমি বললে আমাকে নিয়ে যাবে।

বলতে বলতে তার চোখদুটি জলে ভরে উঠল। লোকটিকে দেখে ভদ্রলোক বলে মনে হয়েছিল। নিমজ্জমান ব্যক্তির তৃণখণ্ড ধরার মত তাই সে তাকে টেনে বসিয়েছিল। এবারে সে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে।

রাসু বললে—নিয়ে যাব, নিশ্চয় নিয়ে যাব।

বীণা বললে—তোমার পায়ে পড়ি আমায় নিয়ে যাও। আমাকে বাঁচাও। এখানে আমি থাকতে পারবো না।

রাসু এবারে বেশ সহজকণ্ঠে বললে—হ্যাঁ, নিশ্চয় নিয়ে যাব। তুমি কি ভালবাসো বল দেখি বীণা ?

বীণা তখন অনেক শান্ত হয়েছে। বললে—কিছুই ভালবাসি না।

—সে কি ? তাই কি হয় ? গয়না ভালবাসো না ?

—না। আমি কি ভালবাসি শুনবে ?

—কি ?

—দই-এর খুরি।

—সে আবার কি ? দই খেতে ভালবাসো বুঝি ?

—তুমি ভারি বোকা। দই নয়, দইয়ের খুরি, মাটির খুরি।

রাসু কৌতূহলী হয়ে ওঠে। বলে—কি হয় সেটা ?

—সেটা আমি খাই যে, ভারী ভাল লাগে খেতে।

রাসু অবাক হয়ে তার মুখের পানে হাঁ করে চেয়ে রইলো।

বীণা বলতে লাগলো—হ্যাঁ, আমার ভারী ভাল লাগে খেতে। নরম নরম ভাঁড়গুলো ভেঙে ভেঙে খাই। দিদি একদিন দেখতে পেয়েছিল। দিদি দেখলে ভারী বকে। তাই করি কি, জানলা দরজা বন্ধ করে—

রাসু হাসছিল। বীণা বললে—বা, হাসছো যে ? তুমিও খেয়ে দেখো, মাইরি বলছি—ভারি ভাল লাগবে।

বলে সে নিজেও হাসতে লাগলো।

॥ চার ॥

পরদিন ভোরে রাসু তার সেই অনুচর দুটিকে সঙ্গে করে ফিরে যাচ্ছিল, বীণা ছুটে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

মুখে তার ম্লান একটু হাসি। যাতে কামিনী শুনতে না পায় অমনি আস্তে বললে—কবে আসবে ? কবে নিয়ে যাবে তাহলে ? আমি ঠিক হয়ে থাকব কিন্তু।

রাসবিহারী বললে—পরশু।

বীণা জিজ্ঞাসা করলে—কেন, কাল আসতে পার না ?

—না।

—কেন ?

—কাজ আছে।

বলেই সে সিগারেটের খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে হন্ হন্ করে নিচে নেমে গেল।

বীণা বিষণ্ণ মুখে সেখানেই চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, কামিনী সস্নেহে তার হাত ধরে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে। বললে—চান করে এসে সকাল-সকাল চারটি খেয়ে-দেয়ে ঘুমো।

বীণা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

কামিনী বললে—ভাবছিস্ কি অমন চুপ করে?

বলে তার চুলে হাত দিয়ে বললে—মাথা আজ আর তোর ভিজিয়ে কাজ নেই, কাল চান করেছিস।

এবারেও সে তেমনি নীরবে একবার মাথাটি কাৎ করে একদৃষ্টে জানলার দিকে তাকিয়ে রইলো।

কামিনী বললে—ঘুম পেয়েছে?

—না।

—সাবান মাখবি?

—উঁহুঁ।

কামিনী বললে—তোর জন্যে কী সুন্দর নতুন সাবান আনালাম ত্যাখ! চল্ কল্‌তলায়, আর দেরী করিস্‌নি।

আদর যত্ন দেখে বীণা অবাক! মাঝে মাঝে অবশ্য কামিনী এক-আধটুকু আদর যত্ন আগেও করতো, কিন্তু আজকে যেন সব-চেয়ে বেশি।

স্নান করিয়ে উপরে এনে একটা নতুন শাড়ি দিয়ে বললে—পর্, পুরোনো কাপড় আজ তোকে পরতে দেবো না।

বীণা বললে—নতুন শাড়ি?

—হ্যাঁরে!

—কবে কিনলে?

—আজই। পরে দেখ কেমন মানায়।

বীণা অবাক হয়ে গেল কামিনীর ব্যবহারে।

কিন্তু কামিনীর এত আদর-যত্ন সন্ধ্যার পরই যে কোথায় চলে গেল কে জানে!

বীণা কেঁদে তার হাতে-পায়ে ধরতেও কসুর করলে না। কিন্তু পায়ে ধরে করুণা ভিক্ষা করলেই করুণা করা যায় না। কামিনীর করুণা অত সুলভ নয়।

কামিনী প্রথমে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কতরকম করে বোঝাবার চেষ্টা করলে। বললে—এ দেহ আমাদের ক'দিনের বাছা। দুদিন বাদেই ত শ্মশান-ঘাটে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তার জন্যে আর এত কেন?

এত যে কেন তা কি ছাই সে নিজেও জানে!

এইটুকু মাত্র শুধু জানে যে, কামিনী যা চায়, তা সে পারে না। দেহ-মন তাই তার ক্ষণে ক্ষণে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মনে হয় সেখান থেকে ছুটে পালায়।

কিন্তু পালাবার পথ নেই। জানে, দরজায় দারোয়ান বসে আছে। আর এখান থেকে পালিয়ে সে যাবেই বা কোথায়? নিতান্ত অপরিচিত এই বিরাট শহরে কে তাকে আশ্রয় দিতে পারে. তা সে জানে না।

দীনুদার ওপর রাগে, ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় তার সমস্ত মন তিক্ত হয়ে ওঠে।

লোকটা এত পাজি! ছি ছি, এমন জানলে কে তাকে প্রশ্রয় দিত? নিস্ফল আক্রোশে বীণা শুধু মনে মনেই গুমরে মরতে থাকে।

দীনুদা তাকে কত-রকম করেই-না ভুলিয়েছিল।

ভুলতে সে চায় নি।

জানত, সে বিধবা—গাঁয়ের আর-পাঁচটা বিধবা মেয়ে যেমন করে জীবন কাটায় তাকেও তেমনি নানা কষ্টের মধ্য দিয়ে, কঠোরতার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতে হবে।

হয়ত কোন্ নিভৃত নিশীথে একাকিনী সে তাদের সেই পল্লীগ্রামের

দোতালা ঘরটিতে শুয়ে আছে—এক-একদিন হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যেত।

মনে পড়ত সন্ধ্যায় যখন সে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়েছে, ঘরে কি বাইরে একবিন্দু আলোর রেখা পর্যন্ত ছিল না।

ঘুম ভাঙতেই সহসা তার সমস্ত দেহে-মনে কেমন যেন একটা অব্যক্ত বেদনা অনুভব করত।

কেন যে সে তা অনুভব করত তা সে কিছুতেই বুঝতে পারত না। দেখত তার সেই অন্ধকার গৃহপ্রান্ত উদ্ভাসিত করে উন্মুক্ত জানালা দিয়ে অজস্র জ্যোৎস্নার আলো তার সেই নিভৃত শয্যায়, তার সেই অর্ধনগ্ন যৌবন-পুষ্পিত তনুদেহে এসে পড়েছে।

বাইরে সুপ্তিমগ্ন নিঃশব্দ ঘুমন্ত পল্লী। পুকুরের পাড়ে সুচিক্কণ, ঘন পত্রপল্লব-সমাচ্ছন্ন তরুশ্রেণী। তারই মাথার উপর অসীম বিস্তৃত নীলাকাশের প্রহরী—জাগ্রত চাঁদ।

বীণার আপাদমস্তক যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।

জ্যোৎস্নালোকে সে তার বিস্রস্ত বসনাঞ্চল দূরে নিক্ষেপ করে নিজেরই সুগোল, সুকোমল দুটি হাত দিয়ে মাথার বালিশটাকে বুকের কাছে টেনে এনে চেপে ধরত।

মনে হতো, সারাটা বিশ্বপ্রকৃতি যেন আনন্দের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। এই বিশাল প্রকৃতির মধ্যে সকলেই আনন্দ-মগ্ন। সে-ই শুধু একাকিনী। সে দুর্ভাগ্যদগ্ধা, অভিশপ্তা!

কিন্তু উপায় নেই।

যার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল, তার ক্ষীণ স্মৃতিটুকু পর্যন্ত তার অতীত জীবনের পৃষ্ঠা থেকে তখন নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

বিগত অতীত, এই ব্যথিত বেদনাতুর বর্তমান, এবং সামনে সুদূর ভবিষ্যৎ—কোথাও যেন ধরবার বা ছোঁবার মত, অবলম্বন বলে আঁকড়ে ধরবার মত কিছুই নেই।

এমনি এক বাসন্তী পূর্ণিমার রাতে দীনুদা তার সেই গন্ধ-সুবাসিত পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে তার কাছে এসে দাঁড়াল।

পুত্র, কন্যা, গৃহ, সংসার—বীণার একমাত্র প্রলোভনের, একমাত্র আকাঙ্খার বস্তু তাকে দেবে বলে সেই দীনুদাই তাকে আজ এখানে টেনে এনে এই দুরবস্থায় ফেলেছে।

পুত্র,কন্যা, ঘর-সংসার সে আজও চায়।

দীনুদা চলে গেছে, কিন্তু রাসুবাবু তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কাল তার আসার দিন। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা তাকে করতেই হবে।

বীণা বললে—আজকের দিনটা দিদি……কালই যে তিনি আসবেন বলে গেছেন।

কামিনী হেসে উঠল হো হো করে।

বললে—আসুক না! ভালই ত!

—তবে ?

—আ-মর। নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় করতে ইচ্ছে করে না ?

ভয়ে বীণা তখন কাঠ হয়ে গেছে। কোন-রকমে তার শুষ্ককণ্ঠে স্বর বের করে বললে—না দিদি।

মন তার শুধু একজনকেই দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করতে চায়।

লতার মত মাত্র একটি সহকার শাখাকে জড়িয়ে জড়িয়ে তাকেই আষ্টে-পৃষ্টে বন্ধন করে পত্রপুষ্পে মঞ্জরিত হয়ে বেঁচে থাকতে চায়।

কিন্তু কামিনী তাকে এ-কথা বলে কেন ?

সেও ত নারী! সে কি তার মনের কথা বোঝে না ?

আবার কামিনী ভাবে, এই অবুঝ মেয়েটা বোঝে না কেন ? এই অনবদ্য বিকশিত যৌবন-সম্ভার একের পদপ্রান্তে সমর্পণ করে কি সুখ যে সে পেতে চায় কে জানে!

এই দুই বিরুদ্ধ মনের সংঘর্ষে বেচারী বীণার দিন-রাত যেন আর কাটতে চায় না।

কামিনীও তাকে নানা-ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু একটা কথা কামিনী জানে না। যারা তার কথায় ভোলে, তাদের জাত আলাদা।

বীণাকে সে অর্থের, গয়নার প্রলোভন দেখায়। কিন্তু কিছুতেই

যখন পারে না, তখন গর্জন করে ওঠে, তোদর জাতকে আমি জানি। একটু বেগ পেতে হবে, এই যা।

বীণাকেও প্রাণপণে যুদ্ধ করতে হয় কামিনীর বিরুদ্ধে।

এমনি করেই চলে।

সময় যেন আর কাটতেই চায় না।

সেদিন সন্ধ্যা হতে-না-হতেই কিছু না খেয়ে ঘরে ঢুকে দরজায় খিল বন্ধ করে দিলে বীণা।

কামিনী তাকে খিল খোলাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলে। অনেক মিনতি করলে।

বীণা তবু দরজা খুললে না।

তখন কামিনী আরম্ভ করলে তর্জন-গর্জন। দাপাদাপি ঠেলা-ঠেলির তার অন্ত রইলো না।

বাইরের উন্মত্ত ঝড়ের মাঝখানে যেন সংকুচিতা ভীতা বলির পশুর মত বীণা সারারাত ছোট্ট ঘরের মধ্যে না ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলে।

জোড়হাত করে সে ভগবানকে ডাকলে। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলে।

কামিনী খুব রেগে গেল।

অনেক রাতেও যখন বীণা দরজা খুললে না, কিছু খেলে না, তখন কামিনী বললে—ঠিক আছে, তবে শুকিয়ে মর্।

বীণা তবুও কিছু বললে না।

কামিনী তখন আবার ভয় দেখালে—দাঁড়া, তবে দ্যাখ, কাল থেকে তোকে দেখাচ্ছি মজা!

॥ পাঁচ ॥

পরদিন রাসুর আসবার কথা।

আজই যে এসে তাকে নিয়ে যাবে।

রাত্রিটা বীণার বড় আশঙ্কায় কেটেছে। ভাগ্যিস্ সে দরজায় খিল বন্ধ করে পড়েছিল! বীণা হাতজোড় করে তাদের গ্রামের জাগ্রত দেবী মা-মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম করলে।

রাসু আজ এলে তাকে সে তার বুদ্ধির কথাটা খুলে বলবে। শুনে সে সন্তুষ্ট হবে নিশ্চয়ই।

রাসু ভালমানুষ, অনেক টাকা তার। কথাবার্তাও ভাল। দীনুদা তাকে গালাগালি দিত। সে যে এত সুন্দরী সে-কথা সে একটা দিনের জন্যেও মুখ ফুটে বলে নি। বিয়ে যদি করতে হয়, তাহলে এই রাসুর মত লোককেই করা উচিত। —হে ভগবান, হে মা মঙ্গলচণ্ডী, সে যেন সন্ধ্যা হতে-না-হতেই আসে!

সকালে দরজা খুলে বীণা বেরিয়ে এলো। দেখতে পেলে, কামিনীর মুখখানা গম্ভীর, তার সঙ্গে কথা বলে না।

চা আর মুড়ি খেয়ে অন্য মেয়েরা বাক্স রং করতে লাগল। বীণা এ-সময় কামিনীর ঘরের দু-একটা কাজ করে দেয়। আজ পিতলের পানের বাটাটা মাজতে গেলে কামিনী কট্‌মট করে চেয়ে বিরক্ত হয়ে বললে—থাক্। মাজতে হবে না।

—ঘরটা ঝাঁট দিই?

—না। বেরো তুই আমার সুমুখ থেকে।

—কেন দিদি?

মুখ ভেংচে কামিনী বললে—দাঁড়া তোকে আজ আমি মানদার কাছে দিয়ে আসছি। উঠতে-বসতে খ্যাংরা মেরে জব্দ করে দেবে। পড়িসনি ত তেমন বাড়িউলীর হাতে। পড়লে বুঝতিস মজা!

একটু থেমে আবার বললে—নাচতে নেমে আবার ঘোমটা! অত

তেজ কিসের। অহঙ্কার, দেমাগ্ দেখলে গা জ্বালা করে। এই যে এতগুলো মেয়ে আছে, তোর মত কে বল্ দেখি?

বীণা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন জবাব দেয় না।

কামিনী বললে—নাই দিলে কুকুর মাথায় ওঠে। অত বেশি আদর দেওয়া আমার উচিত হয় নি।

দুপুরে সকলের খাবার এলো—এলো না শুধু বীণার।

বীণা জিজ্ঞাসা করলে—একি? আমার খাবার নেই?

বামুন-ঠাকুর বললে—বাড়িউলী-মার হুকুম, আজ থেকে খাবার বন্ধ।

কামিনী যে বাইরেই ছিল তা বীণা জানত না।

বললে—কেন ঠাকুর, বন্ধ কেন?

জবাব এলো কামিনীর মুখ থেকে—হ্যাঁ, এই আমার নিয়ম। আমার কথা না শুনলে তোকে উপোস দিতে হবে।

সকালে সামান্য মুড়ি আর চা খেয়ে বীণার ক্ষিদে পেয়েছিল। চুপ করে বসে ভাবলে—রাস্নু এলে এ-কথাও বলে দেবে তাকে।

বীণা ভাবলে, হয়ত তাকে জব্দ করার জন্যে কামিনী এমন করছে, এখুনি খাবার আসবে। কিন্তু খাবার এলো না। প্রয়োজন হলে কামিনী যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে বীণা তা জানত না।

সন্ধ্যা হয়ে এলো।

বীণার খাবার আসা দূরে থাক্, কামিনী ভুলেও তার একটা খবর পর্যন্ত নিলে না।

দিনের শেষে অন্য মেয়েরা বসে বসে সাজ-সজ্জা করছিল। বীণার নিজেকে খুব দুর্বল মনে হচ্ছিল। তবু সে খানিকটা জল খেয়ে চুল বাঁধতে বসলো। যদি রাস্নু আসে, তার সামনে এমনি আলুথালু হয়ে দাঁড়াবে কেমন করে?

সিঁড়িতে কিংবা বারান্দায় জুতোর শব্দ হওয়া-মাত্র বীণা চম্‌কে চম্‌কে ওঠে। উদ্‌গ্রীব হয়ে বাইরেরপানে তাকায়। কিন্তু যে আসে সে রাস্নু নয়।

আবার ঘরের মধ্যে এসে বসে। আয়নায় নিজেকে নিজে ভাল করে দেখে আবার অধীর-ভাবে রাস্থুর অপেক্ষায় পায়চারী করতে থাকে।

রাত যত বাড়ে বীণার আগ্রহও তত বেড়ে যায়।

বিছানার ওপর বসে বসে চোখ বুজে ভাবে, এই বুঝি সে আসছে।

কোথায় যে রাস্থুর বাড়ি তাও বীণা জানে না। তবে নিশ্চয়ই বাড়ি তার খুব প্রকাণ্ড হবে। অত টাকা যখন আছে, তখন গাড়িও আছে।

বীণা কল্পনার চোখে দেখতে লাগল, রাস্থু গাড়িতে চড়ে বসলো। গাড়ি ছুটে আসছে এই দিকেই।

কিছুক্ষণ কাটল।

সিঁড়ির ওপর আবার জুতোর শব্দ। এই বুঝি এলো। বীণা ধড়মড় করে উঠে বসল।

কিন্তু চোখ খুলে দরজার দিকে তাকাতে গিয়ে দেখে সর্বনাশ। রাস্থু নয়, তার বদলে কালো-কালো বেঁটে-খাটো, কিম্ভুত-কিমাকার দুটি লোক হিংস্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তারই দিকে এগিয়ে এলো।

বীণা বসেই ছিল, এবারে উঠে দাঁড়ালো। রুক্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—কে? কে তোমরা? কি চাও?

দরজার খিল তারা ঘরে ঢুকেই বন্ধ করে দিয়েছে। প্রশ্ন শুনে দুজনে হেসে উঠলো।

উন্মত্ত পৈশাচিক হাসি।

সে হাসি যেন সব-কিছু ফুঁড়ে বীণার বুকের ভেতরে গিয়ে তীব্র ভাবে বিঁধে গেল।

তবু সে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে খানিকটা সরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি চাও? কাকে চাও?

মাংসের লোভে ক্ষুধিত ব্যাঘ্র যেমন শীকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে একজন তেমনি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ক্ষুধায়, অনাহারে বীণার মুখ দিয়ে কথা বের হলো না। প্রাণ-পণে কিছুক্ষণ জানোয়ার দুটির সঙ্গে যুদ্ধ করে শুষ্ককণ্ঠে বললে—ছাড়ো!

কণ্ঠে তরে আর স্বর জোগাল না।

দুচোখ বেয়ে দর-দর করে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়লো।

সহসা হাসির শব্দে সচকিত হয়ে শুনলে, যেন বারান্দার ওপর কামিনী খিল্ খিল্ করে হাসছে।

প্রায় আধঘন্টা পরে বীণা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। লোক দুটি তাকে বাধা দিলে না।

দরজা খুলে বীণা দেখে, কেউ কোথাও নেই।

ঘরে ঘরে খিল পড়েছে। কোথায় রাসবিহারী? কামিনী শুধু জেগে কার সঙ্গে যেন রহস্যালাপ করছে। তার কোনও দিকে তাকাবার সময় নেই।

বীণা সন্তর্পণে উপরের সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে গেল। দেখলে, ছাদে তখনও কতকগুলো রং-করা টিনের বাক্স শুকোচ্ছে। মাথার ওপরে অগণিত নক্ষত্র।

ছাদের কিনারে দাঁড়িয়ে বীণা নিচে রাস্তার দিকে তাকালে। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে মুখে একটা অস্ফুট শব্দ করে বীণা সেখান থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বীণা সেদিন ছাদ থেকে পড়ে মারা গেলে, আমাদের গল্পের এখানেই শেষ হতো, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য কি বীণার সৌভাগ্য জানিনা, সেদিন তার মৃত্যু হয় নি।

ঠিক সেই সময়েই পথের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল গেঞ্জিকলের কাচা কাপড়-বোঝাই একটা ঠেলাগাড়ী। বীণা গিয়ে পড়লো তারই ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে হৈ-চৈ, গোলমাল সুরু হলো। দলে-দলে লোক জমে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গে এসে গেল একজন কনেষ্টবল।

রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি ডেকে বীণাকে পাঠানো হলো থানায়,

পরে মেডিক্যাল-কলেজ-হাসপাতালে। কারও কিছু হয়নি, ঠেলা-ওলাদের থানায় গিয়ে এজাহার দিয়ে আসতে হলো।

এদিকে গোলমাল শুনে কামিনীর বাড়ির সিংজীর ঘুম ভেঙে গেল। সে-ই প্রথমে ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখে এসে কামিনীকে জানালে।

বাড়ির মেয়েরা সব ছুটে এসে জড়ো হলো বাড়ির দরজায়। কিন্তু কামিনী কাউকেও যেতে দিলে না। বললে—খবরদার, কেউ যাবি না, গেলেই এক্ষুনি সাক্ষী দিতে হবে।

বাধ্য হয়ে দূরে দাঁড়িয়েই সকলকে দেখতে হলো।

একটু পরে কনেষ্টবলের তাড়ায় রাস্তা নির্জন হয়ে গেল। সকলে চলে গেল।

কামিনী তখন সকলকে নিয়ে উপরে উঠে এসে বললে—দাঁড়া সব, একটা কথা আছে।

এই বলে সে মেয়েদের শিখিয়ে দিলে যে, পুলিশ এলে তারা যেন বলে, বীণা এখানে সম্প্রতি দশ টাকায় একটি ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করছিল।

হ্যাঁ, বলে সম্মতি দিয়ে যে-যার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

শুধু একজন দাঁড়িয়ে রইলো। তার নাম অন্নপূর্ণা, সকলে তাকে অন্ন বলে ডাকে।

অন্ন বললে—মাসি, পুলিশের ব্যাপার, পরামর্শের জন্য একজন উকিলের কাছে যাওয়া উচিত।

কামিনী বললে—পাগল হয়েছিস? পুলিশ আমার কি করতে পারে? আমি উকিলের কান কাটি।

এর ওপর আর কথা চলে না।

কামিনী জিজ্ঞাসা করলে—লোক নেই তোর ঘরে?

মেয়েরা বললে—ছিল ত!

কামিনী রেগে তার মুখের পানে কটমট করে তাকালে। বললে—তবে যে ভারি সাউখুড়ি মারাচ্ছিস! যা বল্‌ছি, বেরো—

অন্ন মাথা হেঁট করে চলে গেল বটে, কিন্তু মনে-মনে কামিনীকে

গালাগালি দিতে লাগল। বললে—হে হরি, নারায়ণ, পুলিশ যেন মাগীকে ধরে নিয়ে যায়। আমরা তাহলে বাঁচি, হাড় জুড়োয়। বীণা বেশ করেছে, বেঁচেছে।

ভয় যে কামিনীর হয় নি তা নয়।

রাত্রে সে ভাল করে ঘুমোতে পারলে না। শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগল, কী জবাব সে দেবে। কি বলে, কত টাকা দিয়ে পুলিশের মুখ বন্ধ করবে।

বীণার নাম তখনও রেজিষ্ট্রী করা হয়নি, ভয় তার সেইখানেই সব চেয়ে বেশি। উকিলের কাছে একবার যাওয়াই উচিত। অন্ন নেহাৎ মন্দ কথা বলেনি।

কামিনী ধড়মড় করে খাট থেকে নেমে সিঁড়ি ধরে তৎক্ষণাৎ নিচে নেমে গেল। সিংজীর ঘরের দরজায় টোকা মেরে ধাক্কা দিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে বললে—বসো, বলি।

সিংজী সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে রইলো, কামিনী বসলো।

কামিনী বললে—তোমাকে পুলিশ এসে হয় ত টানাটানি করতে পারে। শোনো, বলো যে মেয়েগুলো ভাড়াটে। বীণা দশটাকার ছোট একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত। মনে থাকবে ত?

—জরুর—

—তুমি কাল খুব ফজিরে ঘুম থেকে উঠেই আমাকে ডেকে তুলো। ত্বজনে যাব উকিলের বাড়ি।

সিংজী বললে—বহুৎ আচ্ছা।

কামিনী নিশ্চিন্ত হয়ে উপরে উঠে গেল। শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগল, কত টাকা দিয়ে পুলিশের মুখ বন্ধ করা যেতে পারে।

॥ ছয় ॥

কিন্তু এত বলাবলি, এত কড়াকড়ি, এত সাবধানতা সত্ত্বেও নিস্তার সে পেলো না।

পরদিন সকালে কামিনীর উকিলের বাড়ি যাবার কথা।

কিন্তু সকাল হতে-না-হতেই একদল পুলিশ কনেষ্টবলের সঙ্গে ইন্‌স্পেক্টর স্বয়ং এসে কামিনীর ব্যারাক-বাড়িটা ঘেরাও করে ফেললেন। কাউকে একটা কথামাত্র বলবার অবকাশ না দিয়ে তিনি সকলকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে আদালত, আদালত থেকে হাজত।

কামিনীর নামে মামলা চলতে লাগলো।

পুলিশ মামলা করেছে। প্রধান সাক্ষী বীণা। কামিনীর বাড়িতে যে-সব মেয়েরা থাকত তাদের মধ্যে প্রথমে বিদ্রোহ করলে অন্ন। সেই মেয়েটি, যে একদিন উকিলের কাছে যাবার পরামর্শ দিতে গিয়ে অপমানিতা হয়েছিল।

তার দেখাদেখি অন্য মেয়েরাও সাক্ষী দিতে প্রস্তুত হলো—তবে পুলিশ তাদের সঙ্গে আনলে না, বললে, যা বলতে হয় আদালতে বলো।

মোকর্দমার বিস্তারিত বিবরণ দেবার প্রয়োজন নেই।

বীণা এখনও সুস্থ হয়ে ওঠেনি। হাসপাতাল থেকে তাকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়, আবার গাড়ি করে হাসপাতালেই এনে দেয়।

কামিনী জামিন পর্যন্ত পেলো না। কাজেই কোনও মিথ্যা তদ্‌বির করতে সে পারলে না।

তারপর বীণার এজাহার—সে এক ভারী মজার ব্যাপার।

উকিল জিজ্ঞাসা করে—কামিনীকে তুমি চেনো ?

ঘাড় নেড়ে বীণা জবাব দেয়—হ্যাঁ, খুব চিনি।

—সে কে? কি করে সে?

বীণা বললে—কেন, সে আমার দিদি হয়।

উকিল বলে—দিদি? কি রকম দিদি?

—পাতানো দিদি। মাসি বলতে ও বারণ করেছিল কি-না!

—ওকে তুমি কতদিন থেকে চেনো?

—সেই দীনুদা যখন ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল আমায় কলকেতায়। সেই দিন থেকে।

—তারিখ মনে আছে?

বীণা বললে—তাই আবার থাকে নাকি?

—তবু—আন্দাজ? একমাস, দুমাস, তিনমাস—

বীণা একটু ভেবে বললে—তা প্রায় মাসখানেক হলো বৈকি।

ওদিকে কাঠগড়ায় কামিনী দাঁড়িয়ে ছিল। বীণা তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তুমিই বল-না দিদি—মাসখানেক হবে না?

—তোমরা কি নিজেরাই রান্না করে খেতে?

ঘাড় নেড়ে বীণা বললে—না। তা মিছে কথা বলব কেন, আমাদের কাউকে রাঁধতে হতো না। দিদির একজন রাঁধুনী ছিল।

—তোমাদের কি করতে হতো?

—কিছুই না। আমাকে কিছুই করতে হতো না। আর সব মেয়েগুলো খেটে-খেটে মরতো, আমি চুপ করে বসে মজা দেখতাম।

—তোমাকে খাটতে হতো না কেন?

বীণা সলজ্জভাবে বললে—বাঃ, আমি যে সুন্দরী!

—অন্য মেয়েরা কি করতো?

—বাক্স রং করতো। বা-বাঃ! সে কি দুটি-একটি নাকি? গাদা গাদা! সকাল থেকে সেই সন্ধ্যে পর্যন্ত।

উকিল জিজ্ঞাসা করলে—তারপর কি করতো?

বীণা বললে—কাপড় কাচতো, গা ধুতো।

—তারপর?

লজ্জায় বীণার মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল। বললে—যাঃ, ও-সব কথা বলে নাকি ? ছিঃ।

খানিক থেমে উকিল জিজ্ঞাসা করলে—তোমাদের টাকাকড়ি কে নিতো ?

বীণা বললে—কেন, দিদি নিতো। অম্‌নি করে নিয়ে দিদির মেলা টাকা জমেছে। জমবে না ? একসঙ্গে সেদিন সেই—বলে দেব দিদি ? সেই রাসুবাবুর কাছ থেকে—

বলে সে আর একবার কামিনীর মুখের দিকে তাকালে। তার মুখখানি তখন শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

উকিল বললে—বল-না, ওকে আবার জিজ্ঞেস করছ কি ?

বীণা বললে—আমার কাছে এসেছিল—মস্ত বড়লোক। আমায় বিয়ে করবে বলেছিল—রাসবিহারীবাবু তার নাম। সে যেদিন এলো, দিদি নিলো একসঙ্গে এই এতগুলো টাকা—

বলে নিজের হাতখানি তুলে ইংগিতে একগোছা নোটের ধারণা করিয়ে দিয়ে বললে—এতগুলো নোট দিয়ে গেল, দিদির টাকা হবে না ত হবে কার ?

—তোমাদের কি দিতেন ?

—আমাকে একটা সুন্দর কাপড় দিয়েছিল। আর কি দেবে ? আর কতো আদর সোহাগ করলে, ভাবলুম দিদি বুঝি খুব ভাল। কিন্তু তারপর সেই ভয়ংকর লোক দুটোকে ঢুকিয়ে দিলে ঘরে।

—তুমি আত্মহত্যা করতে গেলে কেন ?

বীণা কাঁদ-কাঁদ মুখে বললে—সবরকম কষ্ট সহ্য করতে পারি, তাই বলে ঘরে অম্‌নি লোক ঢোকাবে জোর করে ? তাই মনের দুঃখে—

কয়েকদিন ধরে এম্‌নি নানা প্রশ্ন-উত্তর চলে অবশেষে মামলার একদিন শেষ হয়ে গেল।

হাকিম রায় দিলেন—কামিনী দাসীর ছয় বছর জেল।

যে মেয়েরা বাড়িটাতে বাস করছিল, তাদের পুলিশ জিজ্ঞাসা

করলে, তারা সেখানেই বাস করবে না কোনও আশ্রমে গিয়ে ভাল ভাবে জীবন যাপন করবে।

মজা এই হলো যে একমাত্র অন্নপূর্ণা ছাড়া আর কেউ আশ্রমে যেতে রাজী হলো না।

সে যা-হোক, কোন রকমে হয়ে গেল। এবার আমাদের আসল গল্প সুরু হচ্ছে শুধু বীণাকে নিয়ে।

॥ সাত ॥

বীণা সেরে উঠেছে। এখন আর তার হাসপাতালে থাকার প্রয়োজন নেই।

আরও দু' একদিন আগেই তাকে হয় ত হাসপাতাল থেকে বের করে দিত। দেয়নি শুধু মিস্ বোসের জন্যে। মিস্ তনিমা বোস, হাসপাতালের নার্স। বড় সুন্দর চেহারা। দেখতে অনেকটা বীণার মত। প্রথম দিন থেকেই বীণার সেবাশুশ্রুষার ভার পড়েছিল তার উপর। বীণাকে সে খুব ভালবাসে। যতক্ষণ হাসপাতালে থাকে তার সঙ্গে গল্প করে। তার সঙ্গ যেন ছাড়তে চায় না। বীণার সব কথাই সে জানে।

সেদিন তনিমা বললে—আর ত তোকে আটকে রাখতে পারবো না বীণা, তুই ত চলে যাবি ভাই—

তার কণ্ঠস্বর যেন উচ্ছ্বাসে রুদ্ধ হয়ে আসে।

বীণা নির্বোধের মত তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে।

তনিমা একটু স্থির হয়ে বলে—কোথায় তুই যাবি বীণা?

—আমি?

—হ্যাঁরে। তবে কার কথা বলছি।

একটু থেমে বীণা বললে—গাঁয়েই ফিরে যাব।

—দূর বোকা মেয়ে। এত কেলেঙ্কারীর পর সেখানে গেলে থাকতে পারবি নে।

—তবে ?

তনিমা ভাবতে লাগল, জবাব দিলে না।

বীণা বললে—দীনুদার দেখা পাব না আর, পেলেও তাকে বিয়ে করব না ঠিক। রাম্বুবাবু বড়লোক, ভাল লোক, কিন্তু তার ঠিকানাও ত জানিনে।

তনিমা যেন অকূলে কূল পেলো। বললে—তুই ব্রাহ্ম হতে যদি রাজী থাকিস তবে তোর বিয়ে দিতে পারি।

বীণা বললে—বেরাহ্ম হয়েই ত দীনুদাকে বিয়ে করব কথা ছিল।

—তবে ত ভালই হলো। যাক্ বাঁচা গেল।

তনিমা নিঃশ্বাস ফেললো।

তারপর একটু থেমে বললে—চল্ তাহলে আমার বাড়িতে। সেখানে ভাল-ভাবেই থাকতে পারবি।

বীণার আনন্দের সীমা নেই। যা-হোক্ একটা নিরাপদ আশ্রয় মিলেছে ভেবে সে গ্রামের মা-মঙ্গলচণ্ডীকে মনে-মনে প্রণাম করলে।

যার কেউ নেই, তার ভগবান আছেন।

তনিমার বাড়িতে বীণার নিরাপদ আশ্রয় মিলে গেল।

পথের ধারেই ছোটখাটো দোতলা একখানা বাড়ি। বাড়িতে লোকজন বিশেষ কেউ নেই। নিচের তলার একটা দিক ভাড়া দেওয়া হয়েছে। সেখানে এক বুড়ি ও তার একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে একখানি ঘর নিয়ে বাস করে।

আর একখানা ঘরে থাকে তনিমার দাদা। তনিমা—আর তার সহোদর এক দাদা।

বীণা বলে—এই জন্যেই ভাই আমাদের এত মিল। তোরও একটি দাদা আর নিজে। আমারও একটি দাদা আর—

বলতেই তার সেই নিজের দাদাটির কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়তেই তার চোখদুটি উঠল সজল হয়ে। তার সেই দাদা আজ আর ইহলোকে নেই!

বীণা বললে—দাদার তোর বিয়ে হয়নি ? বৌ নেই ?

তনিমা তাকে সাদরে কাছে টেনে এনে কানে-কানে বললে—হয়েছিল মরে গেছে।

—ইস্ মারা গেছে !

—তাতে ত ভালই হয়েছে।

—ভাল ? কেন ?

—আমার এই দাদার সঙ্গেই তোর বিয়ে দেবো। কেমন ? তুই আমাদের বৌ হয়ে থাকবি।

—যাঃ! বলে হাসতে হাসতে বীণা তাকে ঠেলে দিয়ে বললে—তোর দাদা আমারও দাদা হয়। তুই সব জেনে-শুনে···ধেৎ !

বলে লজ্জায় মুখখানা রাঙা করে বীণা পেছন ফিরে দেওয়ালের গায়ে একটা আর্শীতে তার মুখ দেখতে লাগলো।

তনিমা শুধু মুখ টিপে হাসলো। কোন উত্তর দিলে না।

তনিমার এই দাদাটির নাম গণপতি।

গণপতিই বটে! দিব্যি গোলগাল দেহখানা। সংসারের কাজ-কর্ম কিছুই করে না। বোনের বাড়িতে দুবেলা খায় আর নিচেকার ঘরের জানলাটির কাছে বসে-বসে দিনরাত ভুঁড়ি নাচায়।

গায়ের রং তার কালো। তনিমার মত ফর্সা নয়। চেহারার মিল তাদের কোথাও নেই।

অথচ এক মায়ের পেটের ভাই !

আশ্চর্য! ভাই-বোন বলে চেনাই যেন দায়। শুধু রূপ নয়, ব্যবহারের দিক থেকেও তেমনি !

গণপতি জানলাটির কাছে বসে থাকে। সুমুখের পথ দিয়ে পাড়ার ছেলেরা হেঁটে যায়।

গণপতি ডাকে—ওরে, ও রতনা, শোন ত ভাই !

রতন ঘরে এসে দাঁড়ালে গণপতি আঙ্গুল বাড়িয়ে গড়গড়াটা দেখিয়ে দিয়ে বলে—খা-না, তামাকটা একবার খা-না দাদা !

তামাক খাবার মানে রতন জানে।

ঘরের কোণে বিস্কুটের একটি পুরোণো টিনে তামাক থাকে। পাশে একটি কাগজের বাক্সে থাকে কাঠের কয়লা—কল্‌কেয় তামাক সেজে আগুন ধরিয়ে নিজেই টেনে ধোঁয়া বের করে দিতে হয়।

সেই ধোঁয়া বের করতে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে যদি কেউ টানে ত গণপতি অস্থির হয়ে ওঠে। হাত বাড়িয়ে বলে—আঃ! জ্বালাতন করলে দেখছি! তুই নিজেই যদি টেনে-টেনে পুড়িয়ে ছাই করে দিবি, ত আমি আর শেষে খাব কি! ঘোড়ার ডিম?

রতন হয়ত গড়গড়ার নলটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে যেতে চায়। গণপতি বলে—এই, যাস্ কোথায়?

রতনের হাতে বাজারের থলি। হয় ত সে বাজার করতেই বের হয়েছিল এই পথ দিয়ে।

সে বললে—বাজার যাচ্ছিলুম।

—তা ভাল, না-হয় একটু পরেই যাস্! তাহলে—

—পরে, কেন?

—তাহলে আমিও যাব তোর সঙ্গে।

বলে তাল-পাতার পাখাটি তার হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে গণপতি বললে—দে-না, পাখার এই বাঁটটি দিয়ে পিঠটা একটু চুল্‌কে দে-না ভাই। উঃ, ঘামাচির জ্বালায় গেলুম!

বাধ্য হয়ে তাই করতে হয় তাকে।

গণপতি তার ময়লা বালিসটি হাতের নিচে টেনে এনে কাত হয়ে তামাক টানতে-টানতে দিব্যি আরাম করে চোখ বুঁজে বলে—মাইরি, তোর মত ছোকরা পাড়ায় আর আমি কাউকে দেখলাম না! হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইখানটা আর একবার—বেশ জোরে জোরে, ব্যস, এই ডানদিকে—আহাহা তোর ডানদিকে নয় রে বাপু আমার ডান দিকে··· হ্যাঁ, ঠিক।

পাখাটা হাত থেকে নামিয়ে দিয়ে রতন বলে—উঠি তাহলে গণুদা, তুমিও যাবে বলছিলে না বাজারে? যাবে ত চল না!

গণপতি বলে—না, আমি আর যাব না, তুই-ই যা।

গণপতির ভয়ে পাড়ার ছেলে-ছোকরারা সহজে কেউ আর এই জানলার পাশ দিয়ে হাঁটে না। খুব বেশি প্রয়োজন থাকলেও অন্য গলি দিয়ে ঘুরে যায়।

এইবার সে পাড়ার ছোট-ছোট মেয়েগুলোকেও ডেকে ফরমাস্ খাটাতে সুরু করেছে। কিন্তু একবার যে আসে, দ্বিতীয়বার সে আসতে চায় না।

বিনয়দের বাড়ি থেকে বাজারে যাবার এইটাই সোজা পথ। গণপতির ঘরে একদিন বিনয়ও এমনি নাস্তানাবুদ হয়ে প্রতিজ্ঞা করলে, সে আর কোন দিন ও-পথ দিয়ে হাঁটবে না।

কিন্তু এমনি ভোলা মন, প্রতিদিনই বিনয় ভুলে যায় আর গণপতির হাঁক শুনে চমক ভাঙে।

গণপতি ডাকে—আরে বিনয় যে—

বিনয়কে বাধ্য হয়ে বলতে হয়—কি ব্যাপার গণুদা—

—তুই ত বাজারেই যাচ্ছিস্ ভাই, তা আমাকে দু' পয়সার উচ্ছে আর দু' পয়সার কাঁচালঙ্কা আনতে বলেছে তনি। তা তুই-ই নিয়ে আসিস ভাই। এই নে পয়সা।

বলে একটা সিকি দেয় বিনয়ের হাতে।

বিনয়কে নিতে হয় বাধ্য হয়ে।

গণপতি তখন বলে—যাক্‌গে পয়সাটা যখন নিলি, তখন দু' আনার কুচো চিংড়ি আর এক আনার পটোলও নিয়ে আসিস এই সঙ্গে।

নিজের ভোলা-মনের জন্যে বিনয় নিজেকেই ধিক্কার দেয়। রীতিমত একটা বাজারের ফর্দ ঘাড়ে গছিয়ে দিলে। ভাবে, কাল থেকে এ লোকটাকে সে নিশ্চয়ই এড়িয়ে চলবে।

এমনি করে সকলেই প্রায় গণপতিকে এড়িয়ে চলে।

কিন্তু আজকাল আর গণপতির ভাবনা নেই। বিশ্ব-সংসার

তাকে যদি আজ অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে রাখে তা হলেও সে নিশ্চিন্ত।

খেতে বসে তনিমার মুখের পানে কৃতজ্ঞতা-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে ঈষৎ হেসে বললে—বীণা মেয়েটি বড় খাসা মেয়ে তনিমা।

তনিমা হাসলে। বললে—তোমার মনে ধরেছে?

গণপতি লজ্জায় মাথা নিচু করে বললে—ধেৎ।

তনিমা বললে—ধেৎ কি রকম? তোমার সঙ্গে যে ওর বিয়ে দেবো।

কথাটা সে-রকম করে গণপতি ভাবেনি। আনন্দে তার কালো মুখখানা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললে—বিয়ে? বিয়ে কেন? বিয়ে যে আমি আর করব না ভেবেছি তনিমা। তা···ও মেয়েটির বিয়ে কি এখনও হয়নি?

তনিমা বললে—না।

পাশের দরজায় ঠক্ ঠক্ করে শব্দ হতেই তনিমা তাকিয়ে দেখে বীণা কখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

তার মুখ দেখে মনে হয় কথাটার সে প্রতিবাদ করতে চায়।

তনিমা চোখ টিপে মাথা নেড়ে তাকে নিষেধ করলে। তারপর আবার সে গণপতির মুখের পানে তাকিয়ে বললে—কেন, তাতেই বা কি হয়েছে? বিধবা বিবাহও ত হয় আমাদের।

গণপতি ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ, তা নয় ··· তা বেশ, তাহলে সব ঠিকঠাক করেই ফ্যাল্। এত করে বলছিস্ যখন···

আসল ব্যাপার কিন্তু অন্য ধরণের।

গণপতির বিয়ে হয়েছে, একবার নয়—তুবার। প্রথম বিয়ে যখন হয়, তখনও তার বিধবা মা বেঁচে ছিলেন। তনিমারও তখন বিয়ে হয়েছে। কিন্তু এমনি তুদৈর্ব, একই বছরে গণপতির বৌ মারা গেল—আবার তনিমার ইঞ্জিনীয়ার স্বামীটি কোন্ এক সেতু তৈরী করতে গিয়ে বিদেশেই প্রাণ হারাল।

বৌ গেল, জামাই গেল—সহায়-সম্বলহীনা বিধবা মা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। কল্‌কাতার বাড়িখানা একমাত্র সম্বল।

মূর্খ গণপতি নির্বোধ হোক, কানা নয়, খোঁড়া নয়—বিয়ে তার যেদিন ইচ্ছা সেই দিনই হবে—সেজন্যে চিন্তার কিছু নেই। মার ভাবনা শুধু এই মেয়ে তনিমার জন্যে। বিয়ের পর মেয়ে একমাস মাত্র শ্বশুর বাড়িতে বাস করে এসেছে। নিতান্ত অপরিচিত সেই স্বামীর সংসারে অনাবশ্যক একটা বোঝার মত বিধবা হয়ে আজীবন বাস করার বিড়ম্বনা যে কি মর্মান্তিক তা তিনি জানেন।

মেয়েকে আর সে-দুর্ভোগ যাতে না পোহাতে হয়, মা সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন।

বাড়ির নিচের তলায়, এখন যে-ঘরে গণপতি বাস করছে, সেই ঘরখানি মাত্র নিজের জন্যে রেখে বাকি সমস্ত ঘরে তিনি ভাড়া বসালেন। পরের মুখাপেক্ষী হয়ে মেয়ে যাতে বিড়ম্বিত না নয়, তাই তিনি তনিমাকে ধাত্রীবিদ্যা শিখবার জন্যে ক্যাম্বেলে ভর্তি করে দিলেন।

কলেজে সে ধাত্রীবিদ্যা ভাল করেই পড়েছে, তার ওপর বুদ্ধিমতী, ধাত্রীবিদ্যা তাই সে ভালই শিখল। কিন্তু মার দুর্ভাগ্য, মেয়ের সুখ-সুবিধা তিনি নিজে চোখে দেখে যেতে পারলেন না। কলেজ থেকে পাশ করে তনিমা চাকরী পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই মা মারা গেলেন।

নিচে মাত্র একঘর ভারাটে রেখে, অন্য ভারাটেদের উঠিয়ে দিয়ে তনিমার প্রথম চেষ্টা হলো দাদা গণপতির বিয়ে দিয়ে সুন্দরী একটি বৌ ঘরে আনা। তনিমার একজন সঙ্গিনী চাই।

নিতান্ত গরীবের ঘরের সুন্দরী একটি বয়স্কা মেয়েও জুটল। দিন তাদের মন্দ কাটছিল না: তনিমার সঙ্গে নববধূর ভাবও বেশ জমে উঠল। কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে যে কি হলো। হঠাৎ একদিন এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় মেডিকাল কলেজ থেকে ফিরেই তনিমা তার উপরের ঘরে গিয়ে দেখে, তার নতুন বৌদিদিটি কাপড়ে কেরসিন তেল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

গোলমাল গণ্ডগোলের আর অন্ত রইলো না। নব-বিবাহিতা

বৌয়ের শোকে তার দাদা ছেলেমানুষের মত গড়াগড়ি দিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

তনিমার নানা-বয়েসের নানা ডাক্তার-বন্ধু এসে জুটলো। নার্স বন্ধু এলো, পুলিশ এলো। খুব খানিকটা হৈ চৈ গোলমালের পর ঘণ্টাকয়েকের মধ্যেই হাঙ্গামা-হুজ্জুত সব চুকে গেল।

হাঙ্গামা চুকল বটে, কিন্তু এরপর কাণা-ঘুষোয় পাড়ার মধ্যে একটা বিশ্রী জনরব উঠল। সকলেই বলাবলি করতে লাগল যে, তনিমার স্বভাব-চরিত্র ইস্কুলে তার পাঠ্যাবস্থা থেকেই খারাপ, সে কথা সকলেই জানে। এখন সে স্বাধীন মহিলা, এখন ত আর কথাই নেই।

তনিমার বাড়িতে যে-সব ডাক্তার-বন্ধুদের যাওয়া-আসা চলে তাদেরই মধ্যে একজন নাকি এই নিরপরাধ সুন্দরী বধূটির ওপর অত্যাচার করে। তারই ফলে এই শোচনীয় দুর্ঘটনা। আর শুধু তাই নয়, ব্যাপারটা তনিমা আগাগোড়া সবই জানে, এমনি করে রোজগার করার জন্যেই তার ওই নির্বোধ দাদাটির জন্যে সে বহুদিন থেকেই একটি সুন্দরী মেয়ের সন্ধান করছিল।

সে যাই হোক্, চট্ করে ওসব কথা আমরা বিশ্বাস করি না।

তবে এর পরেও গণপতির আর একটি বিয়ে দেবার চেষ্টা তনিমা যে অনেক করেছে, তা আমরা জানি।

কিন্তু শত্রুপক্ষ বলে, তনিমা সম্বন্ধে জনরবটা নাকি চারিদিকে এত-বেশী প্রচারিত হয়ে গেছে যে শুধু সেই জন্যেই মেয়ে সেখানে কেউ দিতে চায় না।

বীণাকে সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যেই নাকি এখানে এনেছে।

বেচারী বীণা অত-শত বোঝে না।

খাওয়া শেষ করে গণপতি আঁচিয়ে এলো। তারপর খিলি-দুই পান মুখে পুরে, খিলি-দুই হাতে নিয়ে, আপন মনেই নিচে নেমে

গেল। মৃদু হাসিতে তার কালো মুখখানি যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

চটি জুতোর শব্দ তখনও সিঁড়ির ওপর থেকে মিলিয়ে যায় নি—বীণা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গণপতির উচ্ছিষ্ট থালার কাছ থেকে দই-এর খুরিটা তুলে নিয়ে, বেশ করে সেটাকে ধুয়ে ফেলে খানিকটা ভেঙে মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে তনিমার কাছে এসে বললে—দাঁড়া, তোকে আমি দেখাচ্ছি মজা।

ঈষৎ হেসে তনিমা বললে—পরে দেখাস। এখন তুই সরে দাঁড়া এখান থেকে। তোর ওই খাওয়া দেখে আমার সর্বাঙ্গ শির শির করছে।

আরও খানিকটা ভেঙে বীণা তনিমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—খেয়ে ছাখ্ না!

তনিমা বললে—না, বিকেলে তোকে একটি মাটির কলসী আনিয়ে দেবো, খাস্।

বীণা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

গণপতিকে বিয়ে করতে আপত্তি সে বড় কম করেনি। আপত্তি যে শুধু গণপতির চেহারা খারাপ বা স্বামী হিসেবে সে অযোগ্য তাই নয়; প্রথম আপত্তি, সে তার প্রিয় বন্ধু তনিমার সহোদর ভাই। দ্বিতীয় আপত্তি, গণপতি তার জীবনের ইতিহাস সবটুকু না-জেনেই তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে।

কিন্তু তনিমার অনুরোধে তার কোন আপত্তিই টিকলো না।

রাত প্রায় নটার সময় তনিমার এক ডাক্তার-বন্ধু মোটরে করে তাকে সেদিন তার দরজায় নামিয়ে দিয়ে গেল।

গাড়ি চালাচ্ছিলো ডাক্তার নিজেই। তনিমা গাড়ি থেকে নেমে হাসতে-হাসতে হাত বাড়িয়ে ডাক্তারের প্রসারিত হাতে হাত মিলিয়ে বললে—গুড্ নাইট্।

গাড়ি নিয়ে ডাক্তার চলে গেল। জুতোর শব্দ করে তনিমা

ওপরে উঠে গেল। বীণা তারই আগমন প্রতীক্ষায় জেগে বসেছিল। জিজ্ঞাসা করলে—আজ এত রাত যে ?

দামী এসেন্সের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে তনিমা তার কাছে এসে বললে—কেউ এসেছিল আমার খোঁজে ?

বীণা বললে—হ্যাঁ, তিনবার তিন-তিনটি ছোকরা এসে ফিরে গেছে।

—কাউকে চিনিস তাদের ?

—রাঁধুনী বামুন-ঠাকরুণের সঙ্গে কথা হলো, আমি এই দরজার ফাঁকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। দুজনকে চিনি না, তবে একজন—সেই-যে প্রায়ই আসে, সেই ছোকরাটি, অমর না-কি-যেন নাম।

—চিঠিপত্র কিছু রেখে গেছে ?

—না, বলে বীণা কাছে সরে এসে বললে—হাঁপাচ্ছিস্ যে ? খুলে ফ্যাল না এসব। বলে সে তার জামার বোতাম খুলে দিতে লাগল।

জামা-জুতো খুলে পরিচ্ছন্ন হয়ে এসে তনিমা বললে—এই বীণা শোন। দাদা খেয়েছে ? বামুন-ঠাকরুণ চলে গেছে ?

—হ্যাঁ, বাকি শুধু তুমি আর আমি।

ঠিক সেই কথাটিরই যেন প্রতিধ্বনি করে তনিমা একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে—শুধু তুমি আর আমি। আমি আর তুমি!

বলেই মুখ তুলে সেই শুভ্র, সুন্দর, সুচিক্কণ দন্তপংক্তি ঈষৎ বিকশিত করে হেসে তনিমা চোখের ইশারায় তাকে কাছে ডেকে বললে—বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বীণা, আয়-না, শুই দুজনে।

বীণা শোবার জন্যে এগিয়ে আসছিল। তনিমা বললে—আলোটা নিবিয়ে দে, আলো ভাল লাগে না।

ইলেকট্রিকের আলো সুইচ-টিপে নিভিয়ে দিয়ে বীণা বিছানায় এসে বসল।

অন্ধকার ঘরের ভেতর তাদের দুজনের সাদা ধবধবে পাশাপাশি দুটি বিছানা। রাস্তার দিকে রেলিং-দেওয়া ছোট বারান্দাটি অতিক্রম

করে তিনটে বড় বড় দরজার ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্নায় প্রচুর আলো এসে বিছানায় প'ড়েছে।

বীণাকে তনিমা তার কাছে টেনে আনলে।

রাস্তার ও-পারে প্রকাণ্ড একটা লাল-রঙের তেতলা বাড়ির মাথার ওপরে আকাশে চাঁদ জেগে রয়েছে।

সেদিন বোধ হয় পূর্ণিমা। মৃদুমন্দ বাতাস বয়ে চলেছে ? তনিমা বললে—বসে রইলি কেন লা ? শো।

বলে বীণাকে এক-রকম জোর করে শুইয়ে দিয়ে বাহু-বন্ধনে জড়িয়ে বুকের ওপর চেপে ধরে ডাকলে—বীণা!

কণ্ঠস্বরে সে কি আবেগ!

বহুদিনের আকাংখিত মিলনের রাত্রে প্রিয়া যেমন করে প্রিয়-তমাকে ডাকে—এও যেন ঠিক তেমনি।

বীণা তার একান্ত সন্নিকটে তার সেই দীর্ঘপক্ষ্ম দুটি অচঞ্চল চোখ তনিমার সুন্দর মুখখানির ওপর নিবদ্ধ রেখে নিস্তব্ধ অসাড় ভাবে চুপ করে ছিল।

সহসা তনিমা আবেগ-উন্মত চঞ্চলতায় স্থির থাকতে না পেরে বীণাকে আরও কাছে টেনে এনে সেই রক্তিম দুটি ঠোঁটে সজোরে নিজের দুটি কোমল ওষ্ঠ চেপে ধরতেই বীণার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ঈষৎ হেসে সে নিজের মুখখানা সরিয়ে নিয়ে বললে—ও কি রে! পাগল হলি নাকি ?

তনিমার তখন ঘন-ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। বললে—না, তোকে আমার বড্ড ভালো লাগে।

বলেই একটুখানি থেমে সে আবার বললে—পুরুষ হলে তোকে আমি বিয়ে করতাম, বাড়ি ছেড়ে তোর সঙ্গে পালিয়ে যেতাম।

—যাঃ, বলে বীণা একটা চড় মারলে।

—ভাল আমার তোকেও লাগে, তাই বলে ও কি ?

তনিমা হেসে বললে—তোর ভাল লাগে না ছাই! তোর সেই ভানুবাবুকেও ভাল লেগেছিল।

বীণা খিল্‌খিল্‌ করে হেসে বললে—যাঃ ভানুবাবু নয়, দীনুবাবু আর রাসুবাবু। রাসুবাবুকে দেখেছিস্‌ তুই ?

—দেখবার দরকার নেই—তুই আমার দাদাকে বিয়ে কর।

বীণা হেসে বললে—তুই একটা বিয়ে কর-না ভাই তনিমা। কত ভালো-ভালো ছোকরা আসে তোর কাছে।

—বিয়ে ? বলে তনিমা হাসলো। তারপর একটু থেমে বললে —তোর আগে বিয়ে দিই, তারপর দেখা যাবে।

—না ভাই, বিয়ে যদি করতেই হয়, সব-কথা ওকে বলে দেবো আগে।

তনিমা বললে—খবরদার বলছি লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, বলিস্‌নে। বলবি যদি, তাহলে এই শেষ। তোর সঙ্গে আর কথা বলব না।

—বলব না ?

—না।

—কিন্তু না বললে যদি শেষে—

—কোন 'কিন্তু' নেই বোকা মেয়ে। পুরুষ মানুষকে মেয়েদের সব কথা বলতে নেই। জীবনে অনেক দুঃখ ত পেয়েছিস্‌, আরো যদি পেতে চাস্‌, যা-খুশী করগে যা। কিন্তু আমার কথা শুনলে জীবনে সুখ পাবি।

বীণা ভাবলে, হয়ত-বা সত্যি তাই। সে যে নির্বোধ ছেলেবেলা থেকে সে কথা শুনে আসছে। তার এই নির্বুদ্ধিতার জন্যেই হয় ত এত কষ্ট। কিন্তু তনিমা শুধু রূপবতী নয়, বুদ্ধিমতী। আর জীবনের নানান অভিজ্ঞতা তার আছে। বীণা ভাবলে, তনিমার পরামর্শ নেওয়া তার একান্ত কর্তব্য।

॥ আট ॥

গণপতির সঙ্গে বীণার বিয়ে হয়ে গেল।

বিধবা বীণা আজ বধূ! পায়ে আলতা, গায়ে গহনা, পরণে শাড়ি—মানিয়েছে চমৎকার।

গণপতির খুশীর আর সীমা নেই। সিল্কের জামা গায়ে দিয়ে এক-মুখ পান খেয়ে দাঁতগুলি রাঙা করে, হাসতে-হাসতে উপরে এসে ডাকে—তনি!

বীণা ঘোম্‌টা টেনে সরে দাঁড়ায়। তনিমা বলে—কি?

গণপতি বলে—আমি মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে গিছ্‌লুম। ফ্লেশের দর কত জানিস্? বারো আনা সের! আজ আমাদের বাড়িতে কিছু আনলে ত হতো!

তনিমা হেসে বলে—ফ্লেশ মানে ত মাংস! মাংস আজ আমি আনিয়েছি যে!

—এনেছিস্? তবে আর কি! বলে সেখান থেকে চলে যাবার জন্যে গণপতি একবার পেছন ফিরে আবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়। সহজে সেখান থেকে নড়তে ইচ্ছে করে না। বীণার দিকে ঘন-ঘন তাকায় আর বলে—আচ্ছা তনিমা আমাদের একদিন থিয়েটার কি বায়িস্কোপে গেলে হয় না?

তনিমা বলে—আমার যাবার সময় কোথায় দাদা? তুমি যেতে পার তোমার বৌকে নিয়ে!

গণপতি তার পকেটে হাত দিয়ে লম্বা একটা ছাপা বিজ্ঞাপনের কাগজ বের করে বলে—এই ছাখ, মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের কাছে সেই যে বায়িস্কোপটা আছে না, সেখানে যেতেই এই কাগজটা পেলাম। খুব ভাল বায়িস্কোপ—টেন কন্‌ডিমেন্টস্।

তনিমা দেখলে, কাগজের ওপর লেখা আছে—টেন কমাণ্ডমেণ্টস্। হেসে বললে—বেশ ত যেয়ো একদিন, আজও যেতে পার।

—হ্যাঁ ঠিক, আজকে ওয়েদার ভাল আছে, আজই যাওয়া যাক্। ওগো শুনছ? এই!

কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণের এত চেষ্টা সত্ত্বেও বীণা সেই যে উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইল, কিছুতেই সে আর ওদিকে মুখ ফেরালে না।

গণপতি বললে—আচ্ছা দ্যাখ ত তনিমা, ও যদি অম্‌নি ধারা করে ত, হাউ আই উইল টেকিং হিম্ গো?

বলেই সে ইংরাজীটা সংশোধন করে নিলে—ও ইয়েস্ আই ফরগেট, হিম্ নয় হার হবে।

তনিমা বললে—দাঁড়াও লজ্জা ভাঙতে দেরী হবে না? ওরে, ও বীণা, লজ্জা-টজ্জা করিস্ নে ত বাপু, লজ্জা কিসের?

গণপতি এবারে খানিকটা আশ্বস্ত হলো।

বললে—দে-দে, ওকে বুঝিয়ে দে ভাল করে। আমি ততক্ষণ তামাকটা একবার—

বলে সে নিচে যাবার জন্যে সিঁড়িতে পা দিয়েই যেন আপন মনেই বলতে লাগলো—নিজে তামাক-সাজার মত হাঙ্গামা আর কিছু নেই। রাস্তার লোক ডেকে-ডেকে আগে খেতাম, আজকাল আর সেটাও ভাল লাগে না।

বলতে-বলতে সে সত্যিই নিচে নেমে গেল।

তনিমা বীণার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই দেখলে, সেও তখন তার দিকে মুখ ফিরিয়েছে।

তনিমা বললে—অত লজ্জা কেন লা লজ্জাবতী?

বীণা হাসল। সেই চমৎকার হাসি।

তনিমা বললে—দেখচিস্ দাদা আমার কেমন ইংরেজী বলে। কথাটা বলে সে আর নিজেকে সাম্‌লাতে না পেরে হেসে ফেললে।

কিন্তু বীণা অতসব বোঝে না।

কাছে এসে বললে—খাসা ছেলে ভাই। বলবেই ত! তোর চেয়ে ও বেশি পড়েছিল নিশ্চয়ই।

তনিমা এইবার প্রাণপণে তার হাসি দমন করে বললে—বেশি পড়েনি, কম পড়েই এত! বেশি পড়লে ত আর রক্ষে ছিল না।

সত্যি বলে বীণা তাই বুঝলো। ঘাড় নেড়ে বললে—হুঁ।

স্বামী ত দূরের কথা, দুনিয়ার সব কিছু সম্বন্ধে তার এই সরল বিশ্বাস তনিমার বুকে এসে ধ্বক করে বাজল। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যে। বললে—যা-না তামাকটা সেজে দিতে বললে, যা, তামাকটা একবার সেজেই দিগে-যা!

বীণা বললে—দিতে আমার ইচ্ছে করে, কিন্তু পাড়ার যত ছেলেরা এসে জানলায় উঠে এমন করে উঁকি মারে তনিমা, আমার ভারি লজ্জা করে ভাই।

তনিমা বললে—তাহলে যা। জানলাটা না-হয় বন্ধ করে দিবি। দাদাকে ত এই ওপরের ঘরেই থাকতে বলি, কিন্তু ওর যে ওই রাস্তার পাশে ঘরখানি না হলে কিছুতেই চলে না।

বীণা একটু হেসে সত্যিই নিচে নেমে গেল।

সন্ধ্যায় তনিমাকে কাজে যেতে হয়। ঠিক সময়েই সে গা-হাত-পা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে প্রসাধন করে ভাবলে, বীণাকে নিয়ে দাদা যদি বায়স্কোপ দেখতে যায় ত তাকে টাকা দিয়ে যেতে হবে। অথচ সেই যে বীণা তামাক সেজে দেবার জন্যে নিচে নেমে গেছে এখনও ফেরেনি।

ঘড়ি দেখে নিচে নেমে গিয়ে তনিমা দেখলে গণপতির দরজা তখনও বন্ধ। বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে—বায়স্কোপ যদি যাবে ত দাদা যাও। দেরীতে গেলে ত টিকিট পাবে না।

ঘরের ভেতর থেকে চুড়ির শব্দ আর ফিস্ ফিস্ গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। মনে হলো বীণা যেন বাইরে আসতে চাচ্ছে, গণপতি জোর করে তাকে ধরে রেখেছে।

উত্তরের অপেক্ষায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জুতোর শব্দ করে

তনিমা চলে যাচ্ছিলো। ভেতর থেকে গণপতি চীৎকার করে বলে দিলে—আজ আর থাক গে তনিমা, আর-একদিন গেলেই হবে।

বীণা কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, প্রথম কথাটা তার সে উচ্চারণ করেছিল, হঠাৎ স্পষ্ট মনে হলো, গণপতি যেন তার মুখখানা চেপে ধরেছে।

তনিমা মুখ-টিপে একটু হেসে বাইরের দরজায় এসে ডাকলে—ট্যাক্সি।

চলন্ত ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়ালো। তনিমা তাতে উঠে বসলো।

গণপতি আজকাল আর রাস্তার লোককে ডেকে তামাক সাজতে বলে না, পিঠ চুলকে দিতেও বলে না। পাড়ার ছেলেরা আগে শুধু ওই ভয়েই এই পথ দিয়ে চলা বন্ধ করেছিল। কিন্তু আজকাল ব্যাপারটা ঠিক অন্য-রকম দাঁড়িয়েছে।

পাড়ার ছোকরাগুলো—সময় নেই, অসময় নেই, জানলার শিক ধরে লাফিয়ে-লাফিয়ে ওঠে। উঁকি মেরে বলে—কি খবর? তামাক একবার খাবেন নাকি?

প্রথম-প্রথম গণপতি তাদের ঘাড় নেড়ে জবাব দিত। বলত—না, এইমাত্র খেলাম।

কিন্তু দিন-দিন তারা এত-বেশি বাড়াবাড়ি সুরু করে দিয়েছে যে আব্রু রাখা দায় হয়ে উঠেছে।

জানলা বন্ধ করে দিলে ঘরের মধ্যে টেঁকা দায়, অথচ খুললে এই বিপদ! গণপতি একে মোটা মানুষ, সর্বাঙ্গে ঘামাচি, ঘাম সে মোটেই সহ্য করতে পারে না। বীণা তাকে ওপরের ঘরে বসতে বলে।

গণপতি সে-চেষ্টা যে একেবারে করেনি তা নয়। কিন্তু ওপরের দুটো ঘরের মধ্যে কোন ঘর থেকেই সে রাস্তা দেখতে পায় না। দেখতে হলে বারান্দায় এসে নিচের দিকে ঝুঁকে-পড়ে দেখতে হয়। অথচ কি যে তার অভ্যাস, রাস্তাটি তাকে দেখতেই হবে। কিংবা এই ঘরটিতে তার আর কিছু মোহ আছে কি-না তাই-বা কে জানে!

বলে—না বীণা, এখানে আমি থাকতে পারবো না, চল নিচেই যাই!

বাধ্য হয়ে নিচের এই ঘরখানাতে দিনের-বেলা বীণাকেও এসে বসতে হয়। আর এম্‌নি মজা, বীণাকে দেখবার জন্যেই বোধ হয় ছেলেগুলো জানলার শিক ধরে উঠে দাঁড়িয়ে সহজে আর নামতে চায় না।

বলে—কি দাদা, বৌদি এসেছে বলে আমরা বুঝি এবারে পর হয়ে গেলাম?

গণপতি হাত নেড়ে বলে—যা-যা, ডেপোমি করিস্‌ নে, যা।

বীণা হয় ত তখন তার পায়ের-তলায় বসে এক-বুক ঘোমটা টেনে লজ্জায় ঘেমে ওঠে।

ছোঁড়াটা তবু নড়তে চায় না।

বলে—দাদা ত বেহ্মচারী, একি হিঁদু মেয়ে বিয়ে করলে নাকি দাদা?

গণপতি রেগে বলে—যা বলছি বিনয়, না হলে থুতু দেবো। বলে হ্যাক্‌ করে বোধ হয় সে গায়ে থুতু দেবার জন্যেই মুখ বাড়ায়।

তখন সে তাড়াতাড়ি জানলা থেকে নেমে পালায়।

গণপতি এবার বীণার দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে বলে—দেখলে? ওকি, অতখানি ঘোমটা কেন?

বলে সে হাত দিয়ে বীণার ঘোমটা খুলে দিয়ে বলে—দেখুক না শালারা! ওমন বৌ ওরা বাপের-জন্মে দেখেছে কেউ?

বীণাকে তার দেখবার সাধ ষোল আনা।

বীণা বলে—ও, আমাকে দেখবার জন্যেই বুঝি নিচে বসা হয়!

গণপতি হাসে। হেসে বলে—ইয়েস্‌!

বীণা বলে—কেন? আমি কি এতই সুন্দরী নাকি?

মুগ্ধ-দৃষ্টিতে বীণার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে গণপতি বলে—নিশ্চয়ই। নেভার মাইণ্ড।

বীণা বলে—অত-সব ইংরেজী-ফিংরেজী বুঝি নে আমি।

গণপতি বলে—বুঝিনা বললে ত চলবে না। শিখতে হবে।

বীণা এবার উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

গণপতির ভুঁড়িতে হাত দিয়ে বলে—হ্যাগা, তুমি আমায় ইংরেজী শেখাবে?

—শিখবে?

—হ্যাঁ শিখব। লেখাপড়া শিখতে আমার ভারি সাধ।

—হ্যাঁ, কেন শেখাব না? ইয়েস্, আই স্যাল্ লার্ণ ইউ। বলেই কথাটাকে চাপা দেবার জন্যে বলে—নাও পাটা এবার টেপো দেখি।

বীণা পা টিপতে আরম্ভ করেছে এমন সময় আর এক ছোঁড়া উঁকি দিয়ে বলে—কি হচ্ছে গণুদা?

—তোর গুষ্টির মাথা হচ্ছে রে শালা। ধড়মড় করে উঠেই গণপতি তার গায়ে থুতু দিতে গিয়ে দেখে, সে পালিয়ে গেছে।

বার-বার এমনি বিরক্ত করার জন্যে তনিমা সেদিন তার হাত সেলাইএর কলে নিচের ঘরের ওই জানলাটার জন্যে একটা পর্দা তৈরী করে দিয়েছে। গণপতি একা যখন থাকে পর্দা সরিয়ে দেয়, আবার বীণা এলে পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে বলে—কেমন মজা?

বীণা বলে—তনিমার বুদ্ধি কত?

গণপতি বলে—কেন তুমি পার না? কলে সেলাই করতে তুমি জানো না?

বীণা হেসে বলে, জানি।

—আচ্ছা, আজ তাহলে খানিকটা কাপড় আনব, আমার জন্যে একটা ফতুয়া তৈরী করে দিও দেখি।

বীণা হাসতে-হাসতে বলে—না গো না, মিছে কথা বললাম। সেলাই করতে আমি গিয়েছিলাম সেদিন, এই ছাখো এই আঙুলটায় ছুঁচ ফুটে গেছে।

বলে সে তার বাঁ হাতের চাঁপার কলির মত একটি আঙুল গণপতিকে দেখিয়ে বললে—আমায় বিয়ে করলে, আমার কিন্তু কোন গুণ নেই। আমি ভারি বোকা।

—না না, তুমি ভারি বিউটিফুল। বলে সে তাকে জড়িয়ে ধরে বললে—আই লাভ ইউ ভেরী মাচ্।

বীণা তাকে জড়িয়ে ধরে বললে—এর মানে কি আমাকে বুঝিয়ে দাও।

গণপতি মানে বুঝিয়ে দিলে।

বললে—তার মানে—আমি তোমায় খু—ব ভালবাসি।

কথাটা শুনে বীণার মনে আনন্দের আর সীমা রইলো না।

বললে—সত্যি? হ্যাঁগা সত্যি? সত্যি ভালবাসো?

গণপতি বললে—হ্যাঁ, নিশ্চয়। খুব।

বীণা বললে—কোনদিন না-ভালবাসা হবে না?

ঘাড় নেড়ে গণপতি বললে—কিছুতেই না।

—মনে থাকবে ত এ-কথা?

—নিশ্চয়। নিশ্চয় থাকবে।

আনন্দে বীণা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলো না। চুপ করে সজল চোখে সে গণপতির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো।

॥ নয় ॥

গণপতি সেদিন বীণাকে ভাল-ভাল কাপড়-জামা পরিয়ে বায়োস্কোপ দেখতে নিয়ে গেল।

বীণা প্রথম যেতে চায় নি, গণপতি কিছুতেই ছাড়লে না। বললে—চল, খুব ভাল বায়িস্কোপ দেখিয়ে আনি, আমি বুঝিয়ে দেবো।

বীণা বললে—আমার লজ্জা করে।

গণপতি বললে—বারে, লজ্জা করলে চলবে কেন? কই তনিমা ত বায়িস্কোপ দেখে লজ্জা করে না।

এই বলে তনিমার নজির দেখিয়ে গণপতি তাকে ঘর থেকে বাইরে আনলো।

বীণার পরণে সিল্কের শাড়ি, হাতে সোনার চুড়ি, আড়াই-পেঁচি তাগা, পায়ে জড়ি দেওয়া কালো ভেলভেটের জুতো। বীণাকে যেন আর কিছুদিন আগের সে বীণা বলে চেনা দায়!

গণপতি কালো কিম্ভূত কিমাকার, বীণার পাশে তাকে মানায় না।

বীণার সেদিকে লক্ষ্য নেই—কিন্তু গণপতি মাঝে-মাঝে তার নিজের গায়ের সিল্কের জামাটির দিকে তাকাচ্ছিল।

জামাটার এক জায়গায় পানের পিচ লেগে রাঙা হয়ে গেছে। পথের লোক পাছে কেউ বুঝতে পারে যে সে নিজেকে দেখে নিজেই মনে-মনে তারিফ করছে, তাই সে বার-বার পানের সেই দাগ-লাগা জায়গাটার ওপর হাত দিয়ে খুঁত খুঁত করতে লাগল।

বীণা একবার তা দেখতে পেয়ে বললে—লাগুকগে, আমি কাল সাবান দিয়ে কেচে দেবো।

গণপতি বললে—পানের দাগ সাবান দিলেও ওঠে না।

বীণা তা জানত না। বললে—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। বলে গণপতি বীণার আপাদমস্তক একবার ভাল করে দেখে নিলে। মনে-মনে ভাবলে, সত্যিই সে সুখী। এমন সুন্দরী স্ত্রী যার, নিশ্চয়ই সে ভাগ্যবান। তনিমাকে সে মনে-মনে আশীর্বাদ করলে এবং এ-কথা ভাবলে যে সে বিয়ে না করে এতদিন ছিল কেমন করে?

দুজনে পাশাপাশি চলতে-চলতে বড় রাস্তায় এসে পড়লো। ট্রাম আসতে তখনও দেরী আছে।

ট্রাম স্টপেজে ফুটপাথের ওপর দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় লাল একটা গামছায় ভাতের থালা বেঁধে একটি মেয়ে রাস্তা পার হতে-হতে বীণাকে দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লো।

বীণা অত-সব বুঝতে পারেনি। মেয়েটি কিন্তু বার-বার বীণার মুখের দিকে ঘুরে-ঘুরে তাকিয়ে-তাকিয়ে হঠাৎ একসময় বলে বসলো—হ্যাঁ গা, তুমি সেই বীণা নও?

বীণা অবাক হয়ে তার মুখের পানে তাকিয়ে বললে—হ্যাঁ, কিন্তু তোমাকে ত ভাই—

মেয়েটি বললে—চিনতে পারলে না, না? আজকাল কোথায় তুমি আছ ভাই? রামবাগান না সোনাগাছি? তা বেশ করেছ, বাড়িউলীর সঙ্গে আবার থাকে কখনও? নেহাৎ পোড়া অদেষ্ট তাই আমরা ওর হাতে গিয়ে পড়েছিলাম। তবে তোমাকে দেখে আমরা তখনই বলাবলি করতাম যে বীণার যা চেহারা, তাতে ও যদি একলা একটা ঘর ভাড়া নিয়ে বসে ত ওর পয়সা কত লোকে খাবে। তা বেশ করেছ দিদি, আমাদের যেমন কপাল তাই মন্দলোকের পাল্লায় পড়ে ওই রাস্তায় গিয়ে আজ হাড়ির দুগ্‌গতি ভোগ করছি। তাই বলি যে, যার রূপ আছে, বাঁধন আছে, তারই ও-পথে পোষায়—যেমন ধর তোমাদের।

মনের দুঃখে গড়-গড় করে এতগুলো কথা বলে মেয়েটি থামল।

এবার আর বীণার চিনতে বাকি রইলো না। এ সেই কামিনীর বাড়ির অন্নপূর্ণা। এক অন্ন ছাড়া ঝগড়ায় কামিনীর সঙ্গে আর কেউ পেরে উঠতো না।

বীণা একবার গণপতির দিকে ফিরে তাকালো। মাগীর কথা-গুলো শোনেনি তো! দেখলে সে একটু দূরে সরে গেছে।

অন্নপূর্ণা এখন কি করছে, কেমন করে তার জীবন চলে জানবার কৌতূহল হলো বীণার। চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলে—তুমি এখন কি করছ ভাই? আস্তে-আস্তে বল, আমার স্বামী দাঁড়িয়ে আছে।

অন্নপূর্ণা একটুখানি বিস্মিত হয়ে গিয়ে বললে—সোয়ামী কি লা? বাঁধা রেখেছে বুঝি? ওই কালোপানা মিন্‌ষে? টাকাকড়ি আছে লোকটার, না? অনেকদিন দেখা হয় নি ভাই, কত কথা বলতে সাধ হয়। তা ঠিকানাটা তোমার দাও-না ভাই, যাব একদিন তোমার কাছে। আমার ভাই ও-সবে ঘেন্না ধরে গেছে, আর গতর বয়-না দিদি, বেয়রামে ভুগে-ভুগে—

কথা তার তখনও শেষ হয়নি, গণপতি ডাকলে—কই গো এসো, গাড়ি এসে গেছে।

—আসি ভাই। বলে বীণা আর শেষ পর্যন্ত না শুনেই তার স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে। ট্রাম তখন এসে পড়েছে। গণপতি তার হাত ধরে ট্রামে গিয়ে উঠল।

পাছে অন্নপূর্ণা আবার তার ঠিকানাটা চেয়ে বসে ভেবে, ভয়ে বীণা আর সেদিক পানে ফিরেও তাকালে না। গাড়ি ছেড়ে দিলে মুখ ফিরিয়ে একবার দেখলে।

দেখতে পেলো, ভাতের থালাটা হাতে নিয়ে সতৃষ্ণ-নয়নে ময়লা কাপড়খানি পরে মেয়েটা তখনও তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গণপতি জিজ্ঞাসা করলে—কে ও?

জিজ্ঞাসা করবে জানা কথা। কিন্তু বীণা তার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। পরিচয় দিতে গেলে সব কথাই তাকে বলতে হয়, অথচ তনিমা তাকে এত করে বারণ করে দিয়েছে। সে বলেই-বা কেমন করে? এদিকে মিথ্যে কথা বলার অভ্যাস বীণার একেবারেই নেই।

বুকের ভেতরটা তার কেমন যেন করতে লাগল। বললে—ও ···ওই একটা, সেই···তুমি চিনবে না। বলব এরপর।

বলে সে চুপ করে বসে রইল।

গাড়ির সামনে পেছনে চারদিকে পুরুষ। যেদিকে তাকায় সেদিকেই দেখে জোড়া-জোড়া চোখের সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে যায়। সকলেই যেন তার দিকে প্যাট-প্যাট করে তাকিয়ে আছে।

নিতান্ত আড়ষ্টের মত বেঞ্চের এককোণে জড়সড় হয়ে বীণা বসে বসে শুধু অন্নপূর্ণার কথাই ভাবতে লাগল।—হে হরি, হে মা দুগ্‌গা, হে মা মনসা, স্বামী যেন তাকে আর ও-কথা জিজ্ঞাসা না করে।···

ট্রামের যে-দিকে বীণা তাকিয়ে ছিল গাড়িটা একজায়গায় এসে দাঁড়াতেই দেখল, সেই দিকের ফুটপাথের ওপরই একটি কালী-মন্দির।

ভেতরে মা-কালীর মূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে। বীণা তক্‌খনি তার হাত দুটো জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে একটি প্রণাম করলে।

ব্যাপারটা গণপতি লক্ষ্য করেছিল কিন্তু এতগুলো লোকের সামনে কিছু বলতে পারেনি। ধর্ম্মতলায় গাড়ি থেকে নেমেই গণপতি বললে —কালীঠাকুরকে হাত জোড় করে প্রণাম করলে যে?

বীণা বললে—হ্যাঁ করলাম ত।

গণপতি এবার একটুখানি তিরস্কারের ভঙ্গিতে কথা বললে।

বললে—আমরা ব্রাহ্ম। হিন্দুদের ও-সব ঠাকুর দেবতাকে প্রণাম আমাদের করতে নেই জানো না?

বীণা বললে—ওমা! সে কি? তাই বলে মা কালীকে পেন্নাম করব না? অপরাধ হবে যে!

গণপতি বললে—না না—ওসব আমাদের করতে নেই। আর যেন করো না।

বীণা বললে—না গো তুমি জানো না, মা কালী বড় জাগগতো দেবতা। পেন্নাম তুমি করো—এ-সব কারও কথা শুনো না। আমাদের গাঁয়ের ভারতী ভট্‌চাজের ব্যাটা সেই ন্যাপলা—মা-কালীকে একবার পেন্নাম করেনি ত তার ঘাড় মটকে দিয়েছিল।

গণপতি বললে—ধেৎ।

বলেই সে আবার জিজ্ঞাসা করলে—ও-মেয়েটি কে তা ত বললে না? ওই যে তোমার সঙ্গে কথা বললে? বাড়িউলী, রামবাগান কি সব যেন বলছিল—ও-সব ত ভাল কথা নয়।

প্রশ্নটা বীণার বুকে এসে ধ্বক্ করে বাজল। সর্বনাশ! আর ত তার গোপন করা চলে না। গোপনই-বা সে করবে কেমন করে? গোপন করতে সে চায় না। তনিমার নিষেধ সত্ত্বেও যখনই সে-কথা তার মনে হচ্ছে তখনই সে ভাবছে—এটা তার অপরাধ।

বীণা বললে—বলব—চল বাড়ি গিয়ে। এমন করে পথে যেতে যেতে বলতে পারব না। সে অনেক কথা।

গণপতির কেন যেন এটা জানবার অত্যন্ত কৌতূহল হল। বললে

—চল তাহলে বায়িস্কোপ দেখতে-দেখতে বলবে।

—বেশ তাই বলব চল। বলে দু'জনে বায়োস্কোপের ঘরে গিয়ে দেখল, টিকিট ঘর বন্ধ হয়ে গেছে।

অগত্যা বাড়ি ফিরে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

গণপতি বললে—যাক গে পয়সাটা বেঁচে গেল। আর একদিন আসা যাবে।

এই বলে বীণার হাত ধরে ঠিক সাহেব-মেমের মত বুকের ছাতি ফুলিয়ে গণপতি মিউনিসিপ্যাল মার্কেটটা বার-কতক ঘুরে ফিরে বললে—দেখেছ এমন মার্কেট কখনও ?

দেখে বীণা সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। বললে—ভারি সুন্দর। ভাগ্যিস্ তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল!

গণপতির মুখে হাসি যেন আর ধরে না। বললে—খাবে কিছু ?

ঘন ঘন ঘাড় নেড়ে বীণা বললে—না না না, তাই খায়! ছিঃ, জাত যাবে যে! এখানে ত সাহেবরা খায়।

গণপতি বললে—ওঃ, তুমি একেবারে ভিলেজিয়ান, কিছু জানোনা।

বীণা বললে—না বাপু, আমি অত-সব কেমন করে জানব বল ? কিন্তু ছাখো, আর আমি কখনও এখানে আসব না।

—কেন ?

বীণা সলজ্জ ভাবে বললে—তুমি তখন দেখতে পেলে না, ওইদিকে তাকিয়ে ছিলে। সেই সময় একটা লোক আমায় হাতের ইসারা করে ডাকছিল।

গণপতি বললে—ধেৎ, ডাকবে কি রকম ? তাই আবার কাউকে ডাকে নাকি কখনও ?

বীণা বললে—হাঁ, সত্যি বলছি, সেই যে সব সাজানো গোছানো ঘরগুলো রয়েছে না, সেইখানে। হাত বাড়িয়ে লোকটা আমায় ধরে আর কি! আর একটু হলে আমি চেঁচিয়ে উঠতাম।

গণপতি বললে—ওগুলো দোকান। জিনিষ কেনবার জন্যে ডাকছিল। বুঝলে ?

বীণা বললে—কে জানে বাপু, তা হবে হয় ত। আমি আর আসব না, আমার ভয় করে।

কিন্তু আসল কথাটা গণপতি ভোলেনি। সেখান থেকে বীণাকে গড়ের মাঠে নিয়ে গিয়ে ঘাসের ওপর দুজনে পাশাপাশি বসলো।

বীণা বললে—বাঃ দিব্যি মাঠ ত? হ্যাঁ গা, এখানে গরু চরে?

গণপতি বললে—না। তুমি সেই কি অনেক কথা বলবে বলেছিলে, বল এইবার শুনি, তারপর বাড়ি যাব।

বীণার বুকের ভেতরটা কেমন যেন একটা অজানা আশঙ্কায় দুর দুর করতে লাগল। একটা ঢোক গিলে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে—বলি, মন দিয়ে শোন।

তারপর কিছুক্ষণ ধরে কি-যেন ভাবলে সে। বললে—তুমি বল, তুমি সে কথা আর কাউকে বলবে না? তনিমাকেও না?

গণপতি বললে—না।

—আমার ওপর রাগ করবে না?

—না।

—আচ্ছা সেই যা বললে সেদিন হ্যাঁ গা—বলে বীণা তার কোল ঘেঁসে আর একটুখানি সরে এসে গণপতির জামার একটা বোতামে হাত দিয়ে বললে—তুমি আমায় খুব ভালবাসো, না?

গণপতি এবার তাকে একহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললে—হ্যাঁ, সত্যি, মাইরি ভালবাসি।

বীণা তার সেই সরল মুখখানি ওপরের দিকে তুলে আবার জিজ্ঞাসা করলে—কক্‌খনো না-ভালবাসা হবে না? বল—আমার গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি কর।

গণপতি তাই করলে।

—তবে শোন।

বলে বীণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

তারপর সেই অন্নপূর্ণা মেয়েটির সঙ্গে কোথায় তার পরিচয় সব কথা একে-একে বলতে সুরু করে দিলে।

বলতে গিয়ে সরল বিশ্বাসে সহজ-কণ্ঠে সে তার পানুদাদা থেকে আরম্ভ করে রাসুবাবু, কামিনী বাড়িওয়ালী থেকে জীবনের বর্তমান পর্যন্ত সব ঘটনা একটির পর একটি বলে ফেললে।

প্রায় একঘণ্টা সময় লাগল তার সবটুকু গল্প বলে শেষ করতে।

॥ দশ ॥

সম্পূর্ণ বলা শেষ হলে বীণা তাকিয়ে দেখে গণপতি উদাসদৃষ্টিতে তার সামনের আলোকোজ্জ্বল চৌরঙ্গির বিশাল বাড়িগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

বীণা বললে—হলো ত? শুনলে ত? কিন্তু দেখো যেন তনিমাকে কোনদিন বলে ফেলো না, আর সেই যে—সে ত গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়েছি।

গণপতি তার মুখের দিকে একবার তাকালে।

ওমন একাগ্র-দৃষ্টিতে সে কখনও তাকায় না।

তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বললে—ওঠো।

বলে নিজেই উঠে দাঁড়ালো।

বীণা তার হাত ধরে বললে—বোসো না গো। বলা শেষ হলো আর উঠবে? রাগ করলে নাকি?

গণপতি আবার বসলো। বললে—রাগ? না।

কিন্তু এ-জবাব শুনে বীণার কেন যেন মনে হলো—সত্যিই সে রাগ করেছে।

অথচ গণপতির এম্‌নি বোকা মুখ যে রাগ-অভিমান সুখ-দুঃখ—মুখের ওপর যেন কোন কিছুরই ছাপ পড়ে না—মুখ দেখে সহসা কিছু বোঝা যায় না।

বীণা বললে—রাগ করো না বাপু আমার কোনও দোষ নেই।

তনিমাকে আমি বলেছিলাম—না ভাই, বিয়ে আমি করব নাকো। আগে সব-কথা শুনিয়ে দে, তাতেও যদি বিয়ে করে ত করুক।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর গণপতিই প্রথমে বলে উঠল—তনিমা কি বললে ?

—বললে তাতে কি হয়েছে, তুইত আর ইচ্ছে করে কিছু করিসনি, অমন কত হয়!

বলেই সে গণপতির মুখের দিকে নিতান্ত অসহায়ের মত একাগ্র-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আপন মনেই ভাবতে লাগল, হয়ত তনিমার কথাই ঠিক। না বলাই তার উচিত ছিল, বলা তার অন্যায় হয়েছে।

কিন্তু সেই-বা কি করবে ? তনিমার আদেশ-মত চুপ করেই সে ছিল—হঠাৎ রাস্তায় ওই অন্নপূর্ণাই ত সব গোলমাল করে দিলে।

বীণার রাগ হলো অন্নপূর্ণার ওপর।

কিন্তু গণপতি কি সত্যিই রেগেছে ? বীণা তার কোলের উপর হাত রেখে আবার জিজ্ঞাসা করলে—রাগ করলে ? হঁ্যাগা, সত্যিই আমার ওপর রাগ করলে ? বেশ, তাহলে এবার আমি কি করব জানো ?

গণপতি জিজ্ঞাসা করলে—কি ?

বীণা হঠাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে। বললে—তাহলে আমি এবার সত্যিই মরব।

গণপতির ভয় হলো।

বৌ মরার দুঃখ সে জানে। ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে কি এমনি একটা কিছু করে যদি মরে ত হাঙ্গামা অনেক। হাত-পা যে বাঁধা পড়তে পারে, জেল হওয়াও বিচিত্র নয়।

গণপতি তার মনে-মনে কল্পনা করে নিলে—তাদের বাড়ির সেই নিচেকার ঘরখানির নিরুপদ্রব শান্তি, পড়ে-পড়ে আরাম করে তামাক খাওয়া, বীণার এত সেবা-শুশ্রূষা, এসব থেকে বঞ্চিত হওয়ার মত নিদারুণ কষ্ট পৃথিবীতে আর কিছু আছে কিনা কে জানে! আর তা ছাড়া বীণার মত সুন্দরী স্ত্রী—

গণপতির চিন্তার ধারা এখানেই রুদ্ধ হয়ে গেল। হাত দিয়ে বীণাকে জড়িয়ে ধরে নিজেকেই যেন নিজে ভোলাবার জন্যে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চীৎকার করে উঠলো—নো নো নো —আই স্যাল্ নট বিকাম এংগ্রি আপন ইউ!

হাব-ভাব দেখে বীণা মাত্র এইটুকু বুঝল যে, এটা রাগের কথা নয়। জিজ্ঞাসা করলে—তার মানে?

গণপতি প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—নাঃ, রাগ কেন করব? কিন্তু আর যেন—

বীণা বললে—আর যেন—কি?

—কিছু না। ওঠো, চল বাড়ি যাই। এখানে অনেক লোক জড়ো হয়ে যাচ্ছে।

কথাটা মিথ্যা নয়। যে-যায়গায় তারা বসেছিল, সে-রকম জায়গায় স্বামী-স্ত্রীতে অমন করে সাধরণত কেউ বসে না। এক-একজন করে বোধ হয় তাদের মজা দেখবার জন্যেই লোকজন এসে তাদের চারদিকে বসে পড়েছিল।

বসে আর কিছুতেই উঠতে চায় না।

সুতরাং বাধ্য হয়ে তাদের উঠতেই হলো।

আবার ট্রামে চড়েই তারা বাড়ি ফিরছিল। ঠন্ঠনে কালীবাড়ির কাছে গাড়ি এসে দাঁড়াতেই বীণা আবার তার হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে যেমনি প্রণাম করতে যাবে, গণপতি তার হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—এই!

কথাটা সে এত-জোরে বলে বসলো যে, বীণা সহসা চম্‌কে উঠে ভয়ে-ভয়ে হাত দুটি তার নামিয়ে রাখলে।

কাছাকাছি যাঁরা বসেছিলেন, ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে না পেরে এই নব-দম্পতির দিকে ঘন-ঘন তাঁরা তাঁদের কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

একপাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে-বসে বীণা শুধু গণপতির মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে চলল। মা কালীকে প্রণাম করতে না-পেরে

ক্ষুব্ধমনে সে শুধু মনে-মনে বলতে লাগলো—অপরাধ নিয়ো-না মা, স্বামী আমার বড় নির্বোধ।

বাড়ি ফিরে দেখলে, দরজায় একটা কালো-রঙের মোটর দাঁড়িয়ে।

তনিমাও বোধ হয় এইমাত্র বাড়ি ফিরেছে।

গণপতি বললে—অলকবাবুর গাড়ি।

সারা রাস্তার মধ্যে স্বামী তার এতক্ষণে কথা বললে। বীণা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। রাগ তা হলে সে করেনি। গণপতির হাতখানা ধরে সে জিজ্ঞাসা করলে—অলকবাবু খুব বড়লোক, না?

ঘাড় নেড়ে গণপতি বললে—হ্যাঁ, ডাক্তার। বড়লোকের ছেলে।

বীণা বললে—অলকবাবুর চেহারাটা চমৎকার! না?

গণপতি তার ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালে। সিঁড়ির কাছে যে ইলেকট্রিকের আলোটা জ্বলছিল, তার আলোয় বীণা একবার গণপতির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে, মুখে তার রাগের চিহ্ন। কেউ কোন কথা বললে না।

বীণা প্রথমে ঘরে ঢুকে সুইচ-টিপে আলো জ্বাললে। বললে—বসো তুমি ততক্ষণ, জামাটামা খোল। আমিও এগুলো ওপরে খুলে রেখেই আসছি। বাবাঃ, কতক্ষণ ধরে পরে আছি বল ত!

বলে বীণা চলে যাচ্ছিল। গণপতি খপ্ করে তার হাতখানা চেপে ধরে বললে—দাঁড়াও, কথা আছে।

গণপতি বললে—দরজাটা যে হাঁ করে খোলা রাখছো, অলকবাবু বেরোবে যখন, তাকে দেখবার জন্যে খুলে রাখলে নাকি?

এ আবার কি-রকম কথা!

কাথাটার অর্থ বীণা ঠিক বুঝতে পারলে না। ধীরে-ধীরে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে বললে—অলকবাবুকে ত আমি দেখেছি।

গণপতি তক্তপোষের ওপর বসে পড়ে গায়ের জামাটা খুলতে খুলতে শুধু বললে—হুঁ।

জামাটা খুলে বীণার হাতে দিয়ে বললে—রাখো। রেখে এইখানে এসে বোসো।

বীণা তার পায়ের জুতো খুলে ফেলে জামাটা হাতে নিয়ে দেওয়ালের গায়ে ব্রাকেটে ঝুলিয়ে রেখে গণপতির পাশে এসে বসলো।

গণপতি জিজ্ঞাসা করলে—অলকবাবুর সঙ্গে তুমি কথা কও?

ঘাড় নেড়ে বীণা বললে—হ্যাঁ।

গণপতি বললে—কেন, কেন? ভাল চেহারা বলে ওকে তোমার খুব ভাল লাগে বুঝি?

এতক্ষণ পরে বীণা তার কথার মানেটা কতক বুঝল। ভয়ে ভয়ে বললে—না, আমি চাইনি কথা কইতে, তনিমা সেদিন জোর করে···বললে—কথা না কইলে রাগ করব।

হুঁ, বলে গণপতি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—তোমারও ইচ্ছে ছিল তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

বীণা বললে—না গো না, আমার ইচ্ছে ছিল না—সত্যি বলছি, আমার কপাল বড় খারাপ। তোমাকে পেয়েছি আর আমার কিছু চাই না।

গণপতি বললে—হ্যাঁ এই ত কথার মত কথা। যা করেছ করেছ, এখন বিয়ে হয়ে গেছে—বাস, আর কি! ইউ লভ্ মি এণ্ড আই স্যাল মাষ্ট লভ্ ইউ।

বলে সে বীণার একটি হাত ধরে বললে—যাও তুমি ঘেমে উঠেছ, ভাল জামা-কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে, এগুলো বদলে এসো। কিন্তু দ্যাখ আমি যা বললাম—স্বামী দেখতে যতই খারাপ হোক-না হাজবেণ্ডকে ভালবাসা ওয়াইফের ডিউটি, তা যেন মনে থাকে।

বীণা মাথা নিচু করে বসে-বসে কথাগুলো শুনছিল, গণপতি এতক্ষণ দেখতে পায়নি এবার তার মুখের দিকে চাইতেই দেখতে পেল চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছে।

গণপতি বললে—ছি! কাঁদছ তুমি? কেন কাঁদবার কথা ত আমি কিছু বলিনি। যাও জামা-কাপড় ছেড়ে এসো।

ঘাড় নেড়ে বীণা বললে—না।

—কেন ?

বীণা বললে—না। অলকবাবু যাক আগে।

গণপতি বললে—থাক না সে। তুমি তার কাছে যেয়ো না, তার দিকে তাকিয়ো না, কথা বলো না—বাস্। পাশের ঘরে যাও, ধীরে-ধীরে কাপড়-জামা বদলে আবার চলে এসো।

বলে বীণাকে একরকম জোর করেই সে সেখান থেকে তুলে দিল।

বীণা আর মুখ দিয়ে একটি কথাও বলতে পারলে না। শুধু সে তার স্বামীর মুখের দিকে তার বড়-বড় চোখ দুটি তুলে অত্যন্ত সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি মিনতি জানাল তা একমাত্র অন্তর্য্যামীই জানলেন। গণপতি তার বিন্দুবিসর্গও টের পেল না। সে শুধু তাকে এই বলে সাবধান করে দিল যে অলকবাবুর সম্বন্ধে তাদের যে আলোচনা হয়েছে সে-কথা তনিমা যেন কিছু জানতে না পারে।

নীরবে একবার ঘাড় নেড়ে বীণা তার জুতো জোড়াটা হাতে নিয়ে ধীরে-ধীরে বের হয়ে গেল।

ওপরে গিয়ে দেখল তনিমার ঘরের দরজা বন্ধ। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দরজা বন্ধ করে কথা বলতে তনিমাকে বীণা কোনদিন দেখেনি, আজ এই প্রথম। গণপতির কথাটাই তার বেশী করে মনে হলো। মনে হলো, স্বামী তাকে সাবধান করে দিয়ে বড় ভাল কাজ করেছে। অলকবাবু লোক হয়ত সত্যিই ভাল নয়, তার সঙ্গে কথা বলা, তার কাছে যাওয়া নিরাপদ হয়ত নাও হতে পারে। কিন্তু তনিমা ?···বীণা আর বেশি-কিছু ভাবতে পারল না। ধীরে-ধীরে পা টিপে-টিপে পাশের ঘরের দরজা খুলে সে ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে কাপড়-জামা বদল করতে লাগল।

॥ এগারো ॥

পাশাপাশি এই দুটো ঘরের মাঝখানের একটা দরজা দিয়ে পাশের ঘরে যাওয়া যায়। তনিমা সেই দরজাটা খুলে খালি-পায়ে কাপড়ের আঁচলটা জড়াতে-জড়াতে এ-ঘরে এসে বললে—বা-রে! সাড়া দিলিনে যে? এরই মধ্যে চলে এলি কি রকম? বায়োস্কোপ ত এখনও—

ঘাড় নেড়ে অত্যন্ত চুপিচুপি বীণা বললে—বায়োস্কোপ আমরা দেখিনি।

—কেন?

—টিকিট পেলাম না।

তনিমা বললে—সে কি রে। ট্যাক্সিতে গিয়েও টিকিট পেলি না?

বীণা বললে—ট্যাক্সিতে ত যাইনি—ট্রামে।

তনিমা হাসতে লাগল—ও। আমার কাছে ট্যাক্সির ভাড়া নিয়ে দাদা বুঝি পয়সাগুলো বাঁচালে? তোর মত বৌ পেয়ে সংসার করবার সাধ হয়েছে, না? আয় ত ঘরে আয়, বসে-বসে গল্প করি?

বলে সে তার হাত ধরতেই হাতটা তার ছাড়িয়ে নিয়ে বীণা বললে—না ভাই, অলকবাবু—

তনিমা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—কি অলকবাবু? কোথায় অলকবাবু?

বীণা বললে—তোর ঘরে!

তনিমা হেসে উঠল। বললে—অলকবাবুকে নিয়ে বুঝি আমি খিল বন্ধ করে বসে আছি? তোদের মত···তোরা যেমন আজ—আর কেউ নেই, আমি বসে-বসে চিঠি লিখছিলাম।

এই বলে বীণাকে টানতে-টানতে দরজা খুলে তনিমা তার নিজের ঘরে এসে দাঁড়ালো। দেখা গেল, কেউ কোথাও নেই।

বীণা বললে—তবে যে মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজায় ?

তনিমা বললে—হ্যাঁ, মোটরটা অলকবাবুর। ওতেই আমি এসেছি, আবার খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে যাব। রাত্রে ডিউটি।

বীণা একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। তনিমার সঙ্গে তার খাটে এসে বসল। মুখখানা ভার-ভার। পাশেই টেবিলের ওপর চিঠির কাগজ, খাম সব ছড়ানো। বীণা সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দেখে তনিমা জিজ্ঞাসা করলে—কি দেখছিস ? চিঠি ? কাকে লিখছিলাম বল্ দেখি ?

বীণা বললে—কি জানি ভাই আমি ত পড়তে জানিনে। বলেই সে একটু হেসে বললে—অলকবাবুকে, না ?

ঘাড় নেড়ে তনিমা বললে—হেরে গেলি। অলকবাবুকে অত ভাল আমি বাসিনে যে সন্ধ্যেবেলা একলা ঘরে বসে-বসে বিনিয়ে বিনিয়ে তাকে আমি চিঠি লিখতে যাব। আয় ভাল করে চেপে বোস্।

বলে বীণাকে তার আরও কাছে টেনে এনে বললে—বলতে পারলিনে ত ?

বীণা বললে—না।

তনিমা এবার হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে লেখা চিঠির কাগজখানা টেনে এনে বললে—শোন্। নাম বলব না কিন্তু, চিঠিখানা পড়ে শোনাই। শুনে বল্ত দেখি কাকে লিখেছি।

এই বলে তনিমা চিঠি পড়তে লাগল।

সেই যে তুমি রাগ করে মুখ ফিরিয়ে কথা না বলে চলে গেলে তারপর আর দেখা নেই। কেন বলত—এত রাগ কেন ? এ ত ভাল লক্ষণ নয়। তুমি আমায় ভালবাসো বলে কি কারও সঙ্গে আমায় কথা পর্যন্ত বলতে দেবে না। কুমারবাবু তোমার কি ক্ষতি করেছেন শুনি ? মাথায় তার ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল ছিল। সেদিন চুলগুলো তিনি কেটে ফেলেছিলেন। ভাল দেখাচ্ছিল না। তাই বললাম, চুল আর আপনি কাটবেন না কুমারবাবু, চুল থাকলেই

আপনাকে বেশ ভাল দেখায়। আর ত কিছু বলিনি। এ আর এমন কি মারাত্মক হলো ?

কিন্তু কথাটা বলেই আমি তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি —সর্বনাশ! ঝড় উঠছে। হাতের কাছে রিভলবার কি অমনি একটা-কিছু থাকলে বোধহয় তখন তুমি আমাদের দু'জনকেই খুন করে ফেলতেও কুণ্ঠিত হতে না। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য কি তোমার দুর্ভাগ্য ঠিক জানিনে, খুন করা আর হলো না, তুমি উঠে গেলে। তারপর থেকেই তুমি নিরুদ্দেশ। যা তা বলছি, তুমি যাবার পর কুমারবাবু বোধহয় মিনিট পাঁচেকের বেশি আমার কাছে ছিলেন না। তিনি আর আসেন নি। তিনি আসুন আর নাই আসুন, আমার কিছু আসে যায় না, কিন্তু তোমার কি-রকম ব্যবহার বলত ?

আজ তার উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছি তোমাকে। ডাক্তারখানার পাশে তোমার খালি মোটরটা দাঁড়িয়ে আছে দেখে ভারি একটা দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় ঢুকলো। তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসে সোফারকে বললুম—চালাও! তারপর তোমার গাড়িখানা আমার দরজায় ফেলে রেখেছি! থাক্ ওইখানে দাঁড়িয়ে।

গাড়ির জন্যে তুমি ছট্‌ফট্ করে বেড়াচ্ছ, ট্রামে চড়ে ট্যাক্সিতে চড়ে কলে যাচ্ছ—ভেবে আমি ভারি সুখ পাচ্ছি! পথে আসতে আসতে ভয়ানক একটা 'এ্যাক্সিডেন্ট' হয়ে তোমার গাড়ীটা ভেঙে চুরমার হয়ে যেতো ত আমার ভারি আনন্দ হতো। তা আর হলো না। তোমার নন্দ সোফার বোকা হলেও গাড়ি চালাতে সে জানে।

নাঃ, আর কষ্ট তোমায় দেবো না। নন্দর হাতেই চিঠিখানা তোমায় পাঠালুম। চিঠি পেয়ে তখন আর আমায় খোঁজ করতে এসো না যেন। বাড়িতে থাকলেও দরজা আমি খুলব না। তার কারণ আমার সহচরী বীণা—তোমার মত সুন্দর লোকগুলোকে ভারি পছন্দ করে। ইতি—

তোমারই—ত—

শেষের কথাটা শুনে বীণা তাকে এক চড় মেরে বললে—যাঃ ওটা ভাই তুই কেটে দে। ওকি?

তনিমা বললে—তা না-হয় দেবো, কিন্তু বল্ কাকে লিখেছি?

বীণা বললে—জানি না। ও কথাটা তুই কেটে ফ্যাল, নইলে ও-চিঠি আমি জোর করে ছিঁড়ে দেবো।

তনিমা হেসে বললে—না-রে না, তা আমি লিখিনি, ওটা আমি এমনি দুষ্টুমি করে বললুম। তুই ঠিক্ বলেছিলি, চিঠি আমি অলক-বাবুকেই লিখেছি।

বীণা কিন্তু সেই এক-কথাই ধরে রইলো, সত্যি বলছিস ত ভাই? লিখিস্‌নি ত? লিখেছিস ত তোর হাতে ধরে বলছি ভাই তুই কেটে দে।

তনিমা বললে—না-রে না, লিখিনি—লিখিনি। বাবাঃ। এত ভয়। কেন? লিখলামই-বা। ওইটে পড়ে অলকবাবুর মত অমন সুন্দর একটি মানুষ তোকে যদি ভালই বেসে ফ্যালে ত মন্দ কি? বাসুক না। ভালবাসাকে এত অবহেলা করতে নেই হতভাগী—ভালবাসার জন্যে কত মেয়েকে আমি পথে-পথে কেঁদে বেড়াতে দেখেছি—তা জানিস? একটা মেয়েকে আমি জানি—আমাদের সঙ্গে পড়তো—শোন্ তবে গল্প শোন্ বীণা, আয় শো আমার কাছে।

বলে বীণাকে তার পাশে শুইয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললে—মেয়েটির নাম চপলা। সুন্দরী তাকে বলা চলে না। তবে যৌবন-কাল, সেজে-গুজে বেশ ফিটফাট হয়ে থাকতো। বেচারা চিরকাল শুধু নিজে ভালবেসেই মলো, কেউ আর তাকে ভালবাসলে না। এক-একদিন আমার কাছে এসে সে তার ভালবাসার কথা বলতো আর কাঁদতো। সে কান্না যদি তুই তার দেখতিস্ বীণা। আহা বেচারা! আজও তার জন্যে আমার কষ্ট হয়! যাকে সে দু'দিনের জন্যে কাছে পেতো তাকেই সে তাব সর্বস্ব দিয়ে ভালবেসে ফেলতো। কিন্তু নিষ্ঠুর ওই পুরুষ জাতটা এমনি স্বার্থপর যে দু'দিন বাদে তাকে তারা পায়ে দলে চলে যেতো—মেয়েটার দিকে ফিরেও একবার

চাইতো না। কিন্তু এমনি মজা ভাই, চপলাকে আমি এত করে বোঝাতাম, বলতাম আর ঠকিসনে হতভাগী, অত সহজে ও স্বার্থপর জাতকে বিশ্বাস করিসনে। কিন্তু কে কার কথা শোনে! কিছুদিন পরেই দেখতাম মুখে তার হাসি ফুটেছে। সাজ-গোজ আর তেমন ভাল করে করে না। সদা-সর্বদাই কেমন-যেন একটা বিহ্বল ভাব। হেসে বলতাম, আবার কাউকে পেয়েছিস বুঝি? চপলা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলতো, যাক এতদিন পরে মনে হচ্ছে যেন পেলাম। বলে সে তার প্রিয়তমের চিঠি আমায় দেখাতো। জোরে-জোরে পড়ে-পড়ে আমায় শোনাত। বলতো—দেখেছিস? লিখেছে—মানুষের বাইরের রূপটাই কি সর্বস্ব নাকি? তোমার ভালবাসাকে আমি অগ্রাহ্য করি কেমন করে রাণী? তা যদি করি তাহলে যে আমার পাপ হবে।—মনে মনে হাসতাম। কিছুদিন পরেই দেখি—বাইরের রূপকে অগ্রাহ্য করে অন্তরের রূপ যিনি দেখেছিলেন তার সেই মহাপুরুষটি হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেছেন। কোথায় যে পালিয়ে গেছেন তার আর উদ্দেশ মেলে না।

বীণা বললে—আহা বেচারা! তারপর শেষ পর্যন্ত কি হলো তার?

তনিমা বললে—কি আর হবে। হাজার হোক বোকা মেয়ে ত। মার কাছে এতদিনে ধরা পড়লো। দেখে-শুনে বিয়ে একটা দিয়ে মা তাকে শ্বশুরবাড়ী বিদেয় করে দিলেন। আমি ভেবেছিলাম এবার বুঝি মেয়েটা সুখে থাকবে, কিন্তু সুখ তার অদৃষ্টে নেই···শুনলাম স্বামী তার মারধোর করে। চপলা পড়ে-পড়ে মার খায় আর কাঁদে। ছু'একটা ছেলেমেয়েও হয়েছে। একবার একখানা চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল—আমি ভাই বিষ খেয়ে মরব। হয় বিষ খেয়ে নয় জলে ডুবে, নয় গলায় দড়ি দিয়ে—যেমন করে পারি আত্মহত্যা করব। আর পারছিনে। আমার এই চিঠি পাবার পর জানবি আমি মরেছি। মরবার আগে তোকে বড় বেশি করে মনে পড়লো তাই চিঠি লিখলাম।

বীণা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিল। বললে—মরেছে? আহা!

বলতে-বলতে সেই অদেখা চপলার দুঃখে বীণার চোখ দুটো জলে ভরে এলো।

তনিমা বললে—পাগল হয়েছিস? মলে ত সব দুঃখুই চুকে যেতো। শান্তি পেতো। মরেনি। তারপরও মাঝে একবার তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। মুখে সেই চির-দুখিনীর ছাপ, বিয়ে যখন করেনি তখন যদিই বা দু-একদিনের জন্যে ভালবাসার অভি-নয়কেও ভালবাসা ভেবে সুখে থাকতো—এখন আর সে-আশাও নেই। মরতে সে পারে না—মরবে না—অমনি করে বেঁচে থেকে দুঃখভোগ করবে।

এই বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তনিমা বললে—ও-সব মেয়ের জীবনের ট্র্যাজিডিই হচ্ছে ওই।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলো।

তারপর তনিমাই প্রথম বললে—কিন্তু ছাখ বীণা, ওই পুরুষ জাতটাই অমনি স্বার্থপর। ভালবাসার মর্যাদা ওরা দেয় না। ওরা চায় আমাদের রূপ, যৌবন, আমাদের দেহ। কিন্তু ওরা জব্দ হয় কোথায় জানিস? জব্দ হয়—আমাদের কাছে। যে-সব মেয়ের রূপ আছে তারাই ওদের জব্দ করতে পারে। আর জব্দ করাই উচিত। আমাদের পায়ে এসে ওরা লুটিয়ে পড়বে, ভালবাসা ভিক্ষা করবে, ছুটাছুটি করে বেড়াবে, কাঁদবে, দুঃখ করবে, আর আমরা থাকব নির্বিকার। সে-সব যেন আমাদের স্পর্শও না করে। যে যখন যত বেশী আমাদের ভালবাসা নিবেদন করতে চায়—করুক। পুরুষের ভালবাসা আমাদের দিনরাত ঘিরে থাকবে, ওদের নিয়ে আমরা ছিনিমিনি খেলব, বিনিময়ে দেবো শুধুমাত্র একটুখানি হাসি একটু স্পর্শ—জিইয়ে রাখবার জন্যে একটুখানি অভিমান, একটুখানি অভিনয়।

উত্তেজনার মুখে কথাগুলো বলে তনিমা চোখ তুলে দেখল বীণা তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। বললে—

কথাগুলো আমার তুই কিছু বুঝতে পারলি না, না? আচ্ছা দাঁড়া তোকে সোজা করে বুঝিয়ে দিই—শোন্। ছাখ, অলকবাবু আমাকে চায়। অমন অনেক অলকবাবুই আমাকে চেয়েছে কিন্তু ওই চাওয়াই তাদের সার হয়েছে। তারা ভেবেছে হয়ত পেলুম, আসলে কিন্তু আমি তাদের কাছ থেকে নিয়েছি মাত্র, দিইনি কিছু। কেন দেবো? ক্রমাগত দিয়েই যদি যেতুম তাহলে আজ আমারও অবস্থা হতো ঠিক ওই চপলার মত। তার মত সারা জীবনভোর কাঁদতে আমি চাইনে, এবার বুঝলি?

ঘাড় নেড়ে বীণা বললে—হুঁ।

ছাই বুঝেছিস। আচ্ছা কাল যদি অলকবাবু কি ধর এমনি আর-একজন সুন্দর পুরুষ এসে তোকে তার ভালবাসা জানায়, জানিয়ে বলে—তোমায় না পেলে আমি আত্মহত্যা করব, পারবি তার সে ভালবাসা নিতে? তুইও যে তাকে ভালবাসিস এমনি করে অভিনয় করতে পারবি?

বীণা যেন শিউরে উঠল। বললে—না ভাই কিছুতেই না। তোর দাদা যদি জানতে পারে তাহলে আমায় খুন করে ফেলবে।

তনিমা হাসল। বললে—ধর এমন ব্যবস্থা যদি আমি করে দিই যাতে আমার দাদা কিছু টেরও পাবে না, তাহলে পারিস ত?

বীণা বললে—না ভাই, তাও না।

তনিমা বললে—তাহলেই মরেছিস। আচ্ছা তুই কি মনে করিস দাদা তোকে সত্যিই ভালবাসে? আজ না-হয় তোর রূপ আছে, যৌবন আছে কিন্তু এমন একদিন ত হবে যেদিন ও-রূপও থাকবে না যৌবনও থাকবে না, তখন? তখনও তোর স্বামী তোকে এমনি করে ভালবাসবে—তোর বিশ্বাস?

বীণা বললে—কি জানি ভাই অতশত জানিটানি না। ওর পায়ে মাথা রেখে এখন মরতে পারলেই বাঁচি।

তাই যেন মরিস তুই আমি আশীর্বাদ করছি। বলে তনিমা তার মাথায় হাত রেখে হো-হো করে হাসতে লাগল। বললে—তুই

আমার বৌদি হোস বলতে নেই, তাহলেও বলছি তুই আমার পায়ের ধূলো নিস ত ছাখ আশীর্বাদ আরও ভাল করে করি।

হাসি থামলে বললে—বয়ে গেল—কে কোথায় কোন্ মুখপোড়া আমাদের ভালবাসল না কি করল বয়ে গেল। ভগবান আমাদের রূপ দিয়েছে বলে আজ ওরা এসে আমাদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ছে। রূপ যদি না দিতো আর ওদের ভালবেসে যদি কেঁদে-কেঁদে মরেও যেতুম ত ওরা ভুলেও আমাদের দিকে তাকাত না।

আরও কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, দরজায় হঠাৎ ঠক্‌ঠক্ করে শব্দ হলো। বীণা ধড়মড় করে উঠে বসল। তনিমা বললে—কে?

—খোল।

গণপতির ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর।

কাপড়টা ভাল করে পরে তনিমা দরজা খুলে দিল। হাসতে হাসতে বললে—ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি?

গণপতি ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে—অলকবাবু গেল কোথায়?

তনিমা বললে—অলকবাবু ত কই আসেনি দাদা। তোমরা ছুজনেই কি স্বপ্ন দেখছ নাকি? বৌদিও এসে বলে—অলকবাবু, তুমিও বল অলকবাবু—ব্যাপার কি?

গণপতি খানিকটা শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে বললে—ও, অলকবাবু আজ আসেইনি তাহলে। তাহলে আমাদেরই ফরগেটিং।

তনিমা বললে—অলকবাবুর মোটর আমাদের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বলেই ভেবেছ বুঝি তোমরা—

ঘাড় নেড়ে গণপতি বললে—হ্যাঁ।

তনিমা বললে—ও-মোটর আমিই এনেছি।

বলে দেওয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে—আমরা তাহলে এবার খেয়ে নিই বীণা, আমায় আবার খেয়েই বেরোতে হবে।

॥ বারো ॥

খাওয়া-দাওয়ার পর অলকবাবুকে লেখা চিঠিখানি তনিমা তার সোফারের হাতে দিয়ে বললে—চিঠিখানি তোমার বাবুকে দিয়ে দেবে। এতেই সব লিখে দিয়েছি। তোমায় তিনি কিছু বলবেন না। যাও।

মোটর নিয়ে সোফার চলে গেল। সে যাবার পর সেই যে তনিমা বের হলো—বাড়ি ঢুকল পরদিন সকালে।

জড়ি দেওয়া কালো ভেলভেটের জুতো পায়ে দিয়ে, ছাপা সিল্কের শাড়ি পরে ভাড়াটে একটা ট্যাক্সি থেকে তনিমা নামলো। গত রাত্রে তনিমা যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় বীণা তখন তার সাজ-সজ্জা ততটা লক্ষ্য করেনি! এতক্ষণে হঠাৎ তার সেদিকে নজর পড়তেই বীণা জিজ্ঞাসা করলে—ও রকম কাপড়-চোপড় পরে ত কোনদিন তুই কাজে বেরোস না তনিমা, কাল কি তবে কাজে যাসনি ?

তনিমা ম্লান একটু হেসে কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে ইজিচেয়ারে ঢলে পড়লো। জুতো তুটি খুলে ফেলে সেই নিটোল, সুন্দর, শুভ্র পা তুটি চেয়ারের ওপর তুলে বললে—কেন বলুন ত বৌদি, আমায় কি আপনার সন্দেহ হচ্ছে ?

উপহাসটা বীণা বোকা হলেও বুঝল। তার কাছে গিয়ে চেয়ারের হাতলে বসে পড়ে বীণা বললে—না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

চেয়ারের গায়ে মাথা হেলিয়ে গ্রীবা বেঁকিয়ে চোখ তুলে তনিমা বললে—সত্যি শুনতে চাও ? কিন্তু বলতে তোর কাছে ভয় করে।

বীণার কি কৌতূহল হলো কে জানে! এমন কৌতূহল সচরাচর তার হয় না। বললে—হ্যাঁ, সত্যি না ত কি মিথ্যা বলছি। আমার ভাই মিছে কথা বলতে গলায় কেমন যেন আট্‌কে যায়।

তনিমা বললে—আমার ঠিক উল্‌টো। এমন মিছে কথা এক-এক সময় বলি যে, নিজেই ভেতরে-ভেতরে শিউরে উঠি। যাক্—

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তনিমা হাত বাড়িয়ে বীণার হাতখানা চেপে ধরে নাড়াচাড়া করতে-করতে বললে—না, তোর কথাই সত্যি বীণা, কাজে আমি কাল যাইনি। গিয়েছিলাম আমার এক বন্ধুর কাছে।

এই বলে সে একটুখানি থামল। বললে—পুরুষ বন্ধু।

বলেই সে আবার তেমনি গ্রীবা বেঁকিয়ে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে-হাসতে জিজ্ঞাসা করলে—কে বল্ দেখি?

বীণা হেসে বললে—অলকবাবু।

তনিমা বললে—না। বলতে পারলিনে। কাল সেই চিঠি লিখে আবার তার পেছনে ছুটব ততো কাঙাল আমি নই।

বলে সে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। বললে—দেখলি? ট্যাক্সির ভাড়া দেওয়া হয়নি সে কথা ভুলেই গেছি।

বলে সে চাবি দিয়ে আলমারি খুলে দশটাকার একখানি নোট নিয়ে রাস্তার দিকের বারান্দায় গিয়ে রেলিংএর গায়ে ঝুকে পড়ে ডাকলে—সুন্দর সিং!

—মা-জী! বলে পাঞ্জাবী ড্রাইভার গাড়ীর বাইরে এসে ওপরের দিকে তাকালে।

নোটখানা তনিমা তার হাতের ওপর ফেলে দিয়ে বললে—কত?

—সাড়ে আট রোপিয়া। বলে সে তার খাঁকি-রঙের প্যাংলুনের পকেট থেকে চেঞ্জ বের করছিল, তনিমা বললে—থাক্, তুমি সন্ধ্যা ছটায় গাড়ি নিয়ে এসো।

সেখান থেকেই হাত তুলে সেলাম করে সে বললে—বহুৎ আচ্ছা।

বীণার কাছে তনিমা একটি হেঁয়ালি।

গাড়ির ভাড়া দেয় সাড়ে আট টাকা, কোথায় যায়, কি করে—ভাল করে কিছুই জানবার উপায় নেই। তার কথাবার্তার

কতক বীণা বুঝতে পারে কতক-বা পারে না। কিন্তু তবু তাকে তার ভাল লাগে। মনে-হয় দিনরাত তনিমারি কাছে থাকলে সে যেন ভাল থাকে। তনিমা হাসলে, তনিমা ভাল করে কথা বললে, তনিমা সুখে থাকলেই বীণার সুখ।

তবু কেন যে তনিমা তার কাছ থেকে একটা দূরত্বের ব্যবধান টেনে দিনরাত ঘুরে বেড়ায়, কে জানে। এক-একবার মনে হয়—এটা স্বাভাবিক। সে লেখাপড়া জানে না, ভাল করে কথা কইতে পারে না, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে বন্ধু-বান্ধবের কাছে তনিমার বোধ হয় লজ্জা হয়।

কিন্তু আশ্চর্য, তনিমার যত বন্ধু সবই পুরুষ, মেয়ে বন্ধু তার একটিও নেই। কথাটা মনে হতেই বীণা জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা তনি, তোর যত বন্ধু সবই দেখি ব্যাটা ছেলে, কেন বল্ তো?

তনিমা তার মুখের পানে তাকিয়ে একবার হাসল। বললে—মেয়ের বন্ধু মেয়ে! দূর-দূর! সে আমার ভাল লাগে না। মেয়েরা বন্ধুত্ব করবে পুরুষের সঙ্গে, আর পুরুষরা করবে মেয়েদের সঙ্গে। তা নইলে বন্ধুত্বের নেশা যে তুদিনেই কেটে যায় বীণা!

বীণার নিজের কথাটা হঠাৎ মনে এলো। মনে হলো তার সঙ্গে তনিমার বন্ধুত্বের নেশা ত তাহলে এতদিনে কেটে গেছে। বলতে তার লজ্জা হচ্ছিল, তবু সে জিজ্ঞাসা করলে—তাহলে আমার সঙ্গে?

—ব্যস্! অমনি লেগেছে ত তোমার? বলে একটা স্নিগ্ধ হাসি হেসে তনিমা তার হাতখানি চেপে ধরে সস্নেহে তাকে কাছে টেনে আনলো। তারপর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত চুপিচুপি বললে—তোকে কিন্তু বড় ভালবাসি বীণা, তোর কথা আলাদা।

উত্তেজনার মুহূর্তে হঠাৎ আজ এতদিন পরে বীণাও তনিমাকে

তার দুই-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললে—আমারও তনিমা, মাইরি বল্‌ছি—আমারও···

কথাটা সে আর শেষ করতে পারল না। ছল-ছল চোখে তনিমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নিশ্চল মূর্তির মত সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

তনিমা বললে—কাল রাতে ঘুমোইনি বীণা, বড় কষ্ট হচ্ছে, এক্ষুনি আমি স্নান করে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে নিয়ে কাজে বেরোব। তুই সকাল-সকাল দাদাকে খাইয়ে নিজে খেয়ে নে। দুজনে ঘুমোই, কেমন ?

বীণা হাসলো। বললে—ঘুমোতে আমায় দিলে ত!

তনিমা তার আলমারি খুলে ফর্সা কাপড়-জামা বের করতে গিয়ে বললে—দাদা তোর 'পর বড় অত্যাচার করে, না ?

বীণা ঘাড় নেড়ে একটু হেসে বললে—না।

তনিমা আর অপেক্ষা করল না। বললে—বামুনটাকে একটু তাড়াতাড়ি রান্না করতে বল্‌ ভাই! বাজার এসেছে ?

বলে সে স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকল। শোনা গেল, সে সেখান থেকেই বলছে—বাজার কে আনল বীণা ? দাদা ?

বীণা বললে—না। ঝি এনেছে।

—টাকা কোথায় পেলে ?

—উনি দিয়েছেন। বললেন, তনিমার কাছে চেয়ে নিলেই হবে।

তনিমা ডাকলে—বীণা, শোন্‌!

স্নানের ঘরের বন্ধ-দরজার বাইরে থেকে বীণা বললে—কি ?

—ভেতরে আয়-না! দরজা খোলাই আছে।

বীণা ভেতরে ঢুকল। সাবান তেলের গন্ধে ঘর ভুরভুর করছে। তনিমা হেসে বললে—ছোট বোনের কাছে বাজারের খরচটা চেয়ে নেবে! কেন বর তোর রোজগার করতে পারে না ? তুই পারিস না ?

বীণা হেসে বললে—এই জন্যে ডাকলি ?

—হ্যাঁ, তোর সঙ্গে এবার আমি ঝগড়া করব। তুই আমার বড় ভাজ, ঝগড়া করব না ? আমি তোর ননদ, মনে থাকে যেন।

ঘাড় নেড়ে বীণা বললে—থাকবে।

—থাকবে কি রকম ? ভারি যে কথা শিখেছিস দেখছি। দেবো এক্ষুনি গায়ে জল দিয়ে।

বলেই সে বীণার গায়ে-মুখে খানিকটা-খানিকটা সাবান গোলা জল ঢেলে দিয়ে বললে—হলো ত ?

মুখ ফিরিয়ে একটু সরে গিয়ে বীণা বললে—ইস্! একি করলি তনিমা ? সকালে যে আমি একবার···

—না-হয় আর একবারই হলো। বলে তনিমা তার গায়ে আরও খানিকটা জল ছুঁড়ে কাপড় ভিজিয়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে আনল। তারপর তার গায়ে-মুখে খুব করে খানিকটা সাবান ঘষে বললে—আয় দুজনে বেশ ভাল করে চান করি আয়। তুই আমায় সাবান মাখিয়ে দে, আমি তোকে মাখিয়ে দিই।

এমনি করে দুজনে বহুক্ষণ ধরে সাবান মাখামাখি করে মাথায় শ্যাম্পু দিয়ে, হেসে, গল্প করে, জল ছোঁড়াছুঁড়ি করে শুকনো কাপড়-জামা পরে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে-মুছতে যখন স্নানের ঘরের বাইরে এলো, তখন ঢং ঢং করে দশটা বাজল ঘড়িতে।

তনিমা বীণার চুলে স্প্রে টিপে লোশন দিয়ে নিজের হাতে চুল আঁচড়ে দিল। মুখে স্নো মাখিয়ে, সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে ক্লিপ দিয়ে চুল আটকে দিয়ে বললে—যা এবার, দেখিস্ আসতে দিলে হয়।

বীণাও নিচে যাবার জন্যে ছটফট করছিল। মুখ টিপে একটু হেসে বললে—যাই দেখি—স্নান করলো কিনা···

এই বলে সে চলে যেতে-যেতে দরজার কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—তুই খেয়ে নে তনিমা, তোর কষ্ট হবে। আমি ওঁর খাওয়া হলে খাব।

তনিমা বললে—আচ্ছা, সে হবে, তুই যা ত আগে—দাদাকে স্নান করতে বল্ !

কিন্তু সেই যে গণপতিকে স্নান করতে বলবার জন্যে নিচে গেল, সে আজও গেল কালও গেল। ঘড়িতে এগারোটা বাজল, তবু আর ফেরে না !

বামুন-মা খাবার কথা জিজ্ঞাসা করতে এসে দেখল, ইজি-চেয়ারের ওপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় মাথার খোলা চুল মেলে দিয়ে তনিমা ঘুমিয়ে পড়েছে, তার মাথার ওপর বন্‌বন্ করে পাখা ঘুরছে।

ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে ডাকলে—মা !

এক ডাকে সাড়া মিলল না। বারকতক ডাকবার পর তনিমা চোখ মেলে বললে—দাদা খেয়েছে ?

বামুন-মা বললে—না মা, তিনি ত এইমাত্তর স্নান করতে গেলেন দেখলাম !

—বীণা কোথায় ?

—নিচের ঘরে শুয়ে রয়েছে।

আড়চোখে ঘড়ি দেখল তনিমা।

তারপর মুচকি হেসে আবার পাশ ফিরে চোখ বুজে পড়ে রইলো।

বামুন-মা জিজ্ঞাসা করলে—ওঁকে ডেকে দেবো মা ?

ঘাড় নেড়ে তনিমা বললে—না।

গণপতিকে কাছে বসে খাওয়ালো বীণা। তার হাতে পান দিয়ে বীণা একবার বামুন-মার দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে—তনিমা বুঝি খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ?

বামুন-মা বললে—না মা, উনি ত এখনও খাননি।

জুতো জোড়াটা পায়ে দিয়ে ওদিকে গণপতি হাঁকলে—ওগো শুনছো ? তামাকটা অমনি সেজে দিয়ে এসেই বসতে খেতে !

বীণার তখন কাঁদবার মত অবস্থা। খাবার ঘরের বাইরে এসে

গণপতির মুখের দিকে তিরস্কারের ভঙ্গিতে তাকিয়ে বললে—ছিঃ, বললাম তখন আমি হাজারবার···আচ্ছা মানুষ যা-হোক! তামাক তুমি নিজে সেজে নাওগে যাও, তনিমা এখনও খায়নি।

গণপতি বললে—তা বেশ ত। তামাকটা সাজতে আর কতক্ষণ?

—না, আমি পারব না যাও। বলে বীণা চলে যাচ্ছিলো।

গণপতি কট্‌মট্‌ করে সেদিকে তাকিয়ে বললে—হুঁম্‌!

গর্জন শুনে বীণা একবার পেছন ফিরতেই যে-দুটি চোখের দীপ্ত অথচ ক্রুর একটি দৃষ্টির দিকে তার নজর পড়লো, সে-দৃষ্টির অর্থ বড় জটিল। তাকে অমান্য করা বীণার সাধ্যাতীত। তাই সে তক্ষুনি ফিরে এসে বললে—চল তাই, ছাই-পিণ্ডি তোমাকেই ঠাণ্ডা করি আগে, চল!

বলতে-বলতে গণপতির আগেই সে দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল।

ফিরে এসে তনিমার কাছে মুখ দেখাতে তার লজ্জা করছিল। বামুন-মাকে বললে—তনিমাকে তুমি জাগিয়ে দাও বামুন-মা, আমি ততক্ষণ আসন পেতে জল গড়িয়ে রাখি!

খেতে বসে তনিমা কি যে চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে রইলো, বীণাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করল না। বীণাও হেঁটমুখে চুপ করে খেতে লাগল। ভাবল, তনিমা হয়ত রাগ করেছে।

কিন্তু অত সহজে রাগ করবার মেয়ে তনিমা নয়। খাওয়া শেষ করে আঁচিয়ে তার ঘরে গিয়ে তনিমা বললে—বীণা, বলি, অ বৌদি!

হাসতে-হাসতে বীণা তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

তনিমা একবার তার খোলা চুলে হাত দিয়ে দেখল সেগুলো শুকিয়েছে কি-না। চুল শুকায়নি—অথচ বীণার মাথায় যত চুল তত চুল সাধারণত খুব কম মেয়েরই দেখা যায়। বললে—মরবি যে! চুলগুলো শুকিয়ে নে। ওই পাখার নীচে বস্‌। আমি পাখাটা খুলে দিই।

বলে বীণাকে এক-রকম জোর করে ইজি-চেয়ারের উপর বসিয়ে, পাখা খুলে দিয়ে তনিমা নিজেও একটা চেয়ার টেনে তার পাশে গিয়ে বসল। তার দুই হাত দিয়ে বীণার চুলগুলো ইতস্তত ছড়িয়ে আঙুল দিয়ে আঁচড়ে দিতে লাগলো।

বীণার বড় লজ্জা করছিল। বললে—না তনিমা, তুই শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নে, চুল আমি শুকিয়ে নিচ্ছি।

তনিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—কি যেন একটা কথা তোকে বলব-বলব ভাবছি, বলা কিছুতেই আর হয়ে উঠছে না।

বীণা জিজ্ঞাসা করলে—কি কথা তনিমা?

তনিমা বললে—সেই ত মজা! কথাটাই আমার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। বলে একটুখানি থেমে তনিমা আবার বললে—আচ্ছা বীণা, এমন কোনদিন হয়েছে যে কোন পুরুষকে তুই তোর সর্বস্ব দিতে চেয়েছিস্ আর সে তোকে বার-বার অপমান করেছে।

জবাব দেবে কি, বীণা ভাল করে কথা বুঝতেই পারল না। সে তখন মাথা উঁচু করে তনিমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে।

—অমন হাঁ করে কি দেখছিস্ বল্ ত?

—দেখছি তোকে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে আজ।

তনিমা হাসলো। বললে—সুন্দর দেখাচ্ছে না, সুন্দর করে সেজেছি আমি আজ। একটু থেমে বললে—আচ্ছা বল্ ত দেখি, যদি আমার এই রূপ নিয়ে কাউকে ভালবাসতে চাই, আর সে যদি আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাহলে কি রকম হয়?

বীণা বললে—এসব কথা এখন থাক, চল্ শুবি চল্।

দুজনে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

তনিমা বললে—আচ্ছা বীণা, তোর কি মনে হয়? তোর মত আমিও কাউকে বিয়ে করে সুখে সচ্ছন্দে ঘর-সংসার করি। কেমন এই না?

আনন্দে বীণার দুটি চোখ সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে—হ্যাঁ ভাই, বড় ভাল হয় তাহলে।

তনিমা ঘাড় নেড়ে বললে—না, ভাল বোধ হয় হয় না। ছেলেবেলা থেকেই স্বভাব আমার এমনি চঞ্চল যে. কিছুতেই এক জায়গায় মন বসাতে পারি না। আজ যাকে কাছে পাই, কাল সে পুরোণো হয়ে যায়। তাকে আর ভাল লাগে না। স্বামী আমার সে অত্যাচার সহ্য কেন করবে বল্ ত? অবশ্য স্বামীর সঙ্গে চাতুরী যদি আমি করতে যাই ত স্বামী আমার সারাজীবন চেষ্টা করলেও ধরতে আমায় পারবে না কোনদিন—তাও আমি জানি। কিন্তু—

কথা শেষ না করে তনিমা কি যেন ভাবল। তারপর বললে—আমার মত মেয়েকে কোনও পুরুষ বোধ হয় বেশিক্ষণ ভালবাসতে পারে না বীণা। তারা চায় তোর মত মেয়ে। যাকে তারা বিশ্বাস করতে পারে। যে শুধু একান্তভাবে তার স্বামী ছাড়া আর কারও দিকে ভুলেও তাকাবে না কোনদিন। বিচার করবে না, ভেবে দেখবে না, চিনতে চাইবে না, অন্ধের মত চির-জীবন সে তার স্বামীকেই শুধু ভালবেসে যাবে। ভালবাসা তাদের পাক আর নাই পাক!

বীণা বললে—বারে! বিয়ে করেও মেয়েরা আবার আর কাউকে ভালবাসতে পারে নাকি?

তনিমা হাসলো। বললে—পুরুষরা পারে আর মেয়েরা পারে না?

বীণা বললে—না তনিমা, তুই জানিস্ না। তুই একবার বিয়ে করে ছাখ্—মাইরি বলছি, দেখবি তখন—

তনিমা বললে—থাক। তোকে আমি বোঝাতে কিছুতেই পারব না। আচ্ছা সে কথা যাক্, যা বলছিলাম তাই বলি। তুই কুমার-বাবুকে দেখেছিস্?

বীণা হেসে বললে—তাহলে কুমারবাবুকে তুই ভালবেসেছিস্ বল্।

তনিমা হাসল। বললে—দূর পোড়ারমুখী! ভালবাসা কি লা? ভাল কি অমনি যাকে-তাকে বাসলেই হলো নাকি?

বীণার মুখ দেখে মনে হলো, কথাটা সে বিশ্বাস করল না।

কিন্তু আবার কথা বলতে গিয়ে বীণা দেখল, তনিমা চোখ বুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাকলে সাড়া দেয় না।

বীণা আর কোনও কথা বলল না। সেও তখন ভাণ করে কাপড়খানা তার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে তনিমার গায়ের ওপর হাত রেখে চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল।

॥ তেরো ॥

রাত-জাগা ঘুম। সহজে ভাঙবার নয়।

বেলা তখন প্রায় সাড়ে-তিনটে বেজেছে। তনিমার মনে হলো, তার কাঁচা ঘুম কে যেন জোর করে ভাঙিয়ে দিল। চোখ চেয়ে দেখে শিয়রের কাছে বসে আছে অলকবাবু।

বললে—বাপরে বাপ। এত ঘুম কেন দিনের বেলা? রাত জেগেছ বুঝি?

মুখে কিছু না বলে গায়ের কাপড়টা ভাল করে টেনে নিয়ে তনিমা ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে।

অলকবাবু জিজ্ঞাসা করলে—কেন? শেষরাতে বুঝি ডিউটি ছিল?

এতক্ষণে তনিমা কথা বললে—না।

—তবে?

—এম্‌নি।

—এম্‌নি মানে?

—জানি না। বলে তনিমা উঠে বসলো। বসেই জিজ্ঞাসা করলে—বীণা শুয়েছিল এইখানে, কোথায় গেল সে?

তনিমার আগের কথাটার জবাব বোধ হয় অলকবাবুকে আঘাত করেছিল। মুখ দেখে তা বুঝতে পারা যায়নি, কথা শুনে টের

পাওয়া গেল। বললে—তোমার বাড়িতে কে কোথায় শুয়ে থাকবে তা আমি কি জানি!

অভিমানক্ষুব্ধ ব্যথিত কণ্ঠস্বর।

তনিমাও চুপ করে রইল না। বললে—থাক। সে-কথা তোমায় জিগ্যেস করিনি। বলছি, বীণা এখানে শুয়েছিল, তোমায় দেখে সে উঠে গেল, না তার আগেই সে উঠে গেছে।

বলে সে খাট থেকে নিচে নেমে মাথার খোলা চুলগুলো খোঁপার মত করে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে-জড়িয়ে বাইরে যাবার জন্যে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

অলক বললে—ওকে তুমি আমায় দেখাতে চাও না—লিখেছিলে না?

রুক্ষকণ্ঠে হ্যাঁ বলে তনিমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু ফিরে আসতেও দেরী হলো না। চোখে-মুখে জল দিয়ে তনিমা ফিরে এসে দেখে, অলক উঠে দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করছে।

তনিমা তার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে একটু হাসলো। বললে—বোসো। তোমার রাগের মাত্রা এত বাড়ল কেন বল ত!

কৃত্রিম গাম্ভীর্য বজায় রেখে অলক বললে—বিশ্বাসঘাতকের ওপর রাগ হওয়া স্বাভাবিক।

তনিমার মুখের হাসি তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল। ফিরে দাঁড়িয়ে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বললে—কী! আমি বিশ্বাসঘাতক? বলতে লজ্জা করে না?

অলক বললে—তবে কি বলতে চাও বিশ্বাসঘাতক আমি?

তনিমা বললে—নিশ্চয়। বীণাকে তুমি চাওনি? আমাকে ফাঁকি দেওয়া বুঝি সহজ?

অলক একটা সিগারেট ধরিয়ে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললে—আর একটু হলে তুমিও ত আমায় ফাঁকি দিয়েছিলে তনিমা? পাগল কুমারটা তোমার কাছে—

কথাটা তনিমা তাকে শেষ করতে দিল না। হাতজোড় করে তার কাছে এগিয়ে এসে বললে—থামুন মশাই, মেয়েদের সম্বন্ধে ওই রকম উঁচু ধারণাই আপনাদের চিরকাল। তা সে আপনার দোষ নয়, আপনাদের জাতের দোষ।

বলে সে একটু থামলো। বললে—তা নইলে দিব্যি হাসিখুশি মুখে তুমি কিনা সেদিন···বলব ?

—বল না।

—যাও! তুমি আর কথা বোলো না। তবে আর বীণাকে আমার এত ভয় কেন? বললে—সুন্দরী নারীই হচ্ছে পুরুষের কামনার বস্তু। তা সে বীণাই হোক আর তুমিই হও। মুখ দিয়ে কথাটা তোমার বেরোলো কি করে শুনি? ছি!

বলে তনিমা তার কাছ থেকে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে—অন্য মেয়ে হলে সেদিন থেকে তোমার সঙ্গে আর কথা বলতো না।

অলকের সুর একেবারে নরম হয়ে এলো। হেসে বললে—কি যে বল তুমি তনিমা! হাসি-ঠাট্টা বোঝো না? কার সঙ্গে কার তুলনা! বীণা কি তোমার পাশে দাঁড়াতে পারে নাকি?

তনিমা বললে—তা না পারুক্, এ সব খোসামুদির কথা আমি ঢের শুনেছি। কিন্তু তুমি কুমারবাবুর কথা কি বলছিলে শুনি?

—বলছিলাম পাগলাটা ত আমাদের সঙ্গেই পড়তো, ওকে আমি অনেকদিন থেকেই চিনি। এককালে বড়লোক যখন ছিল, তখন এন্তার উড়িয়েছে, আজ আর একটি পাই-পয়সাও নেই। দ্যাখো না কেমন ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে ঘুরে বেড়ায়, দাড়ি-চুল কাটবার পয়সা পর্যন্ত জোটে না। তুমিও তো তাকে অনেকদিন থেকে চেনো, কিন্তু আগে আসতো না, এখন কেন আসে বুঝতে পেরেছ?

তনিমা বললে—কেন আসে?

অলক হাসল। বললে—তাও বুঝতে পার না? তোমার চাল-চলন দেখে ভেবেছে হয়ত তোমার অনেক পয়সা, একদিন ধার-টার কিছু চেয়ে বসবে।

তনিমাও হাসলো। বললে—পাগল! সে-রকম লোক তিনি নন্!

অলক একটুখানি বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বললে—লোকটির প্রতি যে তোমার অসীম শ্রদ্ধা দেখছি! এত ভক্তি ত ভাল নয়।

তনিমাও জবাব দিতে কসুর করল না। বললে—ভাল হোক, মন্দ হোক, শ্রদ্ধার পাত্র যে তাকে শ্রদ্ধা করা উচিত।

অলক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—মেয়েদের শ্রদ্ধা বড় মারাত্মক তনিমা, তাই তো বড় ভয় করে।

তনিমা বললে—একজনকে শ্রদ্ধা করি বলেই যে আর একজনকে ঘৃণা করব, একজনকে ভালো বলা যে আর একজনের ভয়ের কারণ—সে কথা আজ আমি এই নতুন শুনলাম।

অলক বললে—তাহলে শ্রদ্ধা তুমি কর আর একজনকে। মানুষ বড় স্বার্থপর তনিমা, নিজের কথাটাই আগে জানতে চায়।

তনিমা হেসে উঠল। বললে—বাজে কথা, নিঃস্বার্থপরতার অপবাদ পুরুষজাতকে কেউ দিতে পারবে না তা আমি জানি, কিন্তু আমার শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসার উপর কিছু নির্ভর করে কি? আমি কাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করলাম, না ভালবাসলাম, না ঘৃণা করলাম, তাতে কার কি বয়ে গেল?

—বয়ে যদি কারও যায় তনিমা?

এই বলে অলক তার জবাবের অপেক্ষায় সকরুণ নয়নে তনিমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

তনিমাও তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—যায় নাকি?

—নিশ্চয় যায়।

—মিথ্যা কথা।

অলক বললে—না, মিথ্যা কথা নয়।

তনিমা বললে—থামো! তা যদি হ'তো তাহলে আজ পাঁচ দিন কেউ না এসে থাকতে পারতো না। চিঠি পাবার অপেক্ষা না করে মলো কি বাঁচলো সে-খবরটাও অন্ততঃ একবার জানতে চাইতো।

দেখতে-দেখতে অলক একেবারে গলে জল হয়ে গেল। তক্ষুনি উঠে দাঁড়িয়ে তনিমার কাছে গিয়ে বললে—রাগ করেছ তনিমা ?

বলেই সে হাত বাড়িয়ে তনিমার হাতখানা ধরতে যাচ্ছিল কিন্তু তনিমার দৃষ্টি হঠাৎ সামনের দরজার দিকে পড়তেই সে যেন শিউরে কয়েক পা সরে গিয়ে তার সেই সন্ত্রস্ত মুখের ওপর জোর করে হাসি টেনে এনে বললে—আসুন আসুন কুমারবাবু।

কুমার পা বাড়িয়ে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। টানা-টানা সুন্দর দু'টি চোখ, বিস্তৃত ললাট, সমুন্নত নাক, আজানুলম্বিত বাহু। একটু হেসে সে অলকবাবুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে—এই যে ভালো তো ?

অলক মুখ তুলে একবার তাকাল। হুঁ বলে কেমন যেন অন্য-মনস্কভাবে অনিচ্ছাসহকারে একবার ঘাড় নেড়ে হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আবার আর একটা সিগারেট ধরাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কুমার তখনও দাঁড়িয়েছিল। তনিমা বললে—বসুন কুমারবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন যে ?

কথাটা শুনবামাত্র অলক সিগারেটটা ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে চোখের পাতাদুটি তুলে তনিমার দিকে একবার বক্র-কটাক্ষ নিক্ষেপ করে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বললে, হ্যাঁ—বসুন।

ব্যাপারটা বোধ হয় কুমার বুঝতে পারল। তার চেয়েও বেশি বুঝল তনিমা। কুমার বললে—থাক্। বসবার জন্যে আসিনি। এসেছিলাম···শুনলাম কাল তুমি আমার খোঁজে সারারাত···

সর্বনাশ !

কথাটা যাতে অলকের সামনে শেষ করতে না পারে তার জন্যেই বোধ হয় তার হাতখানা ধরে ফেলে তনিমা তাকে ইজিচেয়ারের কাছে টেনে এনে বললে—বসুন। শুনব এরপর।

অলক উঠে দাঁড়ালো। দীর্ঘনিশ্বাসের পরিবর্তে এক-মুখ সিগারেটের

ধোঁয়া ছেড়ে বললে—আমি চললাম তনিমা, তোমাদের প্রাইভেট কথাবার্তা আমার সামনে হওয়া উচিত নয় বলেই মনে হচ্ছে।

তনিমা তার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে বললে—বটে!

—তা নয় ত কী? বলে অলক পেছন ফিরে দ্রুতপায়ে দরজার কাছে গিয়ে বললে—গুড্‌বাই!

বলেই সে আর অপেক্ষা না করে সিঁড়ির ওপর জুতোর শব্দ করতে-করতে নিচে নেমে গেল।

তনিমা দরজার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কুমার গলাটা তার পরিস্কার করে ফের কি যেন বলবার জন্যে উদ্যত হতেই তনিমা ফিরে তার কাছে গিয়ে ম্লান একটু হেসে বললে—আপনারা বড় নিষ্ঠুর কুমারবাবু।

কথাটা কুমার ভাল করে বুঝতে পারল না। বললে—কারা নিষ্ঠুর?

তনিমা বললে—এই পুরুষজাতটা।

কুমার হাসল। বললে—হ্যাঁ, একটুখানি নিষ্ঠুর করেই বিধাতা আমাদের তৈরী করেছেন। তা নইলে নারীর নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে না পেরে পৃথিবী থেকে আমাদের বিদেয় নিতে হতো।

তনিমা একটুখানি বিস্মিত হয়ে বললে—সে কি? আপনার মুখে এই কথা শুনব তা ত ভাবিনি।

কুমার বললে—কার মুখ থেকে কখন কি রকম কথা বেরোবে আগে থেকে তা ভেবে রাখলে বড় ঠকতে হয় তনিমা। যাক্, আমি শুনলাম কোন একটি মহিলা আমার খোঁজে গিয়েছিলেন! শুনে প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এমন কে মহিলা এলো—আমার খোঁজে···তারপর অনেক ভেবেচিন্তে আবিস্কার করলাম যে বোধ হয় তুমিই। তুমি গিয়েছিলে নাকি? কি প্রয়োজনে? হঠাৎ?

—হ্যাঁ আমি কাল সারারাত ধরে থিয়েটারের বাইরে অপেক্ষা করেছিলাম তোমার সঙ্গে একটু কথা বলব বলে। কিন্তু···

—হঠাৎ তুমি ?

তনিমা কোন উত্তর দিল না।

কুমার এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি, এবারে তার মুখের পানে তাকিয়ে দেখল চোখ ছুটি তার ছল ছল করছে। বললে—একি তনিমা, তুমি কাঁদছ নাকি ? তোমার চোখে ত জল কখনো দেখিনি।

তনিমা তার হাতের রুমাল দিয়ে চোখছুটি একবার মুছে নিয়ে বললে—দেখেন নি ? আপনার দৃষ্টিশক্তি তাহলে একটু ক্ষীণ বলতে হবে।

কুমার বললে—হয়ত তাই। কিন্তু ব্যাপার ত বিশেষ ভাল বলে বোধ হচ্ছে না তনিমা। কি হলো তোমার ?

তনিমা তবুও কোন উত্তর দিল না।

॥ চোদ্দ ॥

কিছুক্ষণ কেটে গেল।

তনিমা হঠাৎ কুমারের একখানি হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে কি যেন বলতে গেল। কিন্তু মুখে কোনও কথা ফুটল না।

কুমার অবাক। এম্‌নি করে তার হাত সে কোনদিন চেপে ধরেনি। আজ তনিমার মধ্যে সে যেন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছে। কুমার বললে—তনিমা, তোমার সব-কিছুর মধ্যেই যেন একটা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। থিয়েটারের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা, আমার হাত চেপে ধরা···কিন্তু তোমার কথা ত কিছুই শুনতে পেলাম না।

তনিমা বললে—স্থির হয়ে বস্থন আগে। কথা কি অম্‌নি যখন তখন বললেই হলো।

কুমার হাসলো, বললে—তা সত্যি, কথা যখন-তখন বলা নিশ্চয়ই যায় না, কিন্তু সেই কথা শোনবার লোক কাছে যখন-তখন পাওয়া অবশ্য যায়। শোনবার লোকটিও যখন-তখন যে রকম অবস্থাতেই হোক আসতেও পারে! সুতরাং বল তোমার কথা। স্পষ্ট পরিস্কার করে বল—লজ্জা সংকোচ বা ভণিতা যদি করতে চাও, চোখে বড় বিশ্রী ঠেকবে।

তনিমা বললে—আপনাকে এনে বোধ হয় আপনার অনেক ক্ষতি করে দিলাম?

কুমার হাসল। বললে—ক্ষতি? ডেকে এনে? কই, ডেকে ত তুমি আনোনি। আমি ত নিজেই অবাক তোমার কথা শুনে। আমার ইচ্ছে না থাকলে তুমি হাজার বার গেলেও আমি আসতাম না নিশ্চয়ই। পথে আসতে-আসতে সেই কথাই ভাবছিলাম।

—কি কথা?

—মনে হচ্ছিল যে আসবার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। শুধু প্রস্তুত নয়, একেবারে উন্মুখ হয়ে ছিলাম। কেন এমন হয় বলতে পারো? খবরটা পেয়েই তাই চলে এলাম। তোমাকে তো অনেকদিন আগেই দেখেছি, কিন্তু এখন যে তোমাকে একবারটি দেখবার জন্যে মন আমার দিনরাত ছট্‌ফট্ করে!

এ-কথার জবাবে তনিমা শুধু বাইরের বারান্দার দিকে একবার তাকাল। একবার কুমারের মুখের পানে তার সেই স্বচ্ছ, সুগভীর আয়ত চোখ দুটি তুলে ধরল। পরক্ষণেই একেবারে যেন অকস্মাৎ নিজেকে হারিয়ে ফেলে তার সেই ব্যগ্র ব্যাকুল দুটি হাত বাড়িয়ে কুমারের গলাটা বেষ্টন করে তারই বুকের 'পরে মাথা রেখে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

কুমার বিস্মিত, হতবাক। এতটা সে আশা করেনি! মুহূর্তের জন্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে সে যেন অবাক হয়ে চুপ করে বসে রইলো। তারপর সোজা হয়ে উঠে বসে তনিমার হাত দুটি সযত্নে তার কাঁধ

থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মুখখানি তুলে ধরে বললে—একি তনিমা ? একি হলো তোমার ?

তনিমার দুই গাল বেয়ে তখন অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়ছে, কথা বলবার শক্তি নেই। কিছু না বলে আবার সে হাতদুটি তুলে কুমারকে ধরতে যাচ্ছিল—কুমার সোফার ওপর একটুখানি সরে বসল। বললে—কি বলবার আছে বল তনিমা, আগে শুনি, তারপর—

—তুমি জান না ?

—এমন বিশেষ কিছু নয়।

মাথাটা নীচু করে তনিমা ধীরস্বরে বললে—আমি তোমায় চাই !

কুমার একটু হাসলো। হাসি দেখে মনে হলো, জোরে হাসবার শক্তি তখন তার নেই। বললে—পাগল ! আমি কি তোমায় পাবার যোগ্য ? ভুল করে দুদিনের জন্যে চেয়ে শেষে অনুতাপ করবে, তার চেয়ে বেশ করে একবার ভেবে দ্যাখো।

তনিমা বললে—দেখেছি। দুদিনের জন্যে নয়—তুমি আমায় বিয়ে করো।

কুমার বললে—না, তা হয় না তনিমা।

—কেন, কেন হয় না ?

—বিয়ে আমি করব না তনিমা। বিশেষত তোমায় ত নয়ই। তোমায় আমি চিনি।

এবারে তনিমা যেন আহত হয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলো। কুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—চেনো ! তার মানে ?

কুমার বললে—মানে শুনতে চেয়ো না তনিমা, তাতে লাভ বিশেষ কিছু হবে না। কিছুদিন আগে যদি এম্‌নি নির্জনে তুমি আমার কাছে এম্‌নি করে আত্মসমর্পণ করতে, তাহলে হয়ত সাধ্য ছিল না তোমায় প্রত্যাখ্যান করি। কিন্তু আজ—

—কি হয়েছে আজ ?

—না। আজ আমি অনেক দেখে আর অনেক ঠকে তোমাদের বেশ ভাল করে চিনেছি।

—চিনেছ ?

—হ্যাঁ।

তনিমা হাসল অদ্ভুত এক হাসি।

কুমার বললে—চেনা বড় শক্ত তা জানি। তবে 'টাইপ্' দেখে খানিকটা চেনা অবশ্য যায়। যতটুকু চিনেছি—আমার পক্ষে ওই-টুকুই যথেষ্ট।

তনিমা চুপ করে কি যেন ভাবল। ভেবে বললে—মেয়েদের তুমি ঘৃণা কর ?

ঘাড় নেড়ে কুমার বললে—না। কিছুদিন করেছিলাম ঠিকই। তারপর দেখলাম তাও শক্ত। সুন্দরী নারী দেখলে এখনও কেমন যেন ভালবাসতে ইচ্ছে করে। এই ধর-না কেন—তোমায় দেখেও—

এই পর্যন্ত বলে সে তার কথা শেষ করল না। হঠাৎ চুপ করে কি যেন ভেবে সে উঠে দাঁড়ালো। বললে—আজ আমি চললাম তনিমা। পারি ত আবার একদিন আসব। কিন্তু আমায় পাবার আশা তুমি ছেড়ে দাও।

বলেই কুমার চলে যাচ্ছিল, তনিমা কিন্তু কিছুতেই যেতে দিল না। হাত বাড়িয়ে তার হাতটা ধরে আবার তাকে টেনে এনে বসাল। বললে—ভয় নেই। আর আমি কিছু করব না। আমার কতকগুলো কথা আছে। আপনি শেষ পর্যন্ত শুনে যান।

কুমার বললে—তুমি বলতে-বলতে আমায় হঠাৎ 'আপনি' বললে কেন জানি না। তুমিই বল।

—না।

—কেন ?

—তুমি বলার অধিকার ত আপনি আমায় দিলেন না।

কুমার এতক্ষণ পরে তনিমার মুখের পানে আবার তাকাল। বললে—আচ্ছা তনিমা, দেহের সম্বন্ধ ছাড়া নারীর সঙ্গে পুরুষের

আর কোনও সম্বন্ধ কি হবে না? কেন, তুমি ত ইচ্ছে করলে আমায় তোমার হিতাকাঙ্খী বন্ধু ভাবতেও পার।

তনিমা গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললে—পারব না।

কুমার গম্ভীর ভাবে বললে—হুঁ। পারবে না তা জানি। পারবার মেয়ে তুমি নও।

—আমি কী?

কুমার বললে—তুমি যে কি তা ত তুমি নিজেই ভাল করে জানো তনিমা, আমার কাছ থেকে সে-কথা নাই-বা শুনলে!

—তবু শুনি। নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণা হয়ত ভুলও হতে পারে।

কুমার বললে—নিতান্তই শুনবে তাহলে?

—হ্যাঁ, শুনব।

—সত্য কিন্তু অপ্রিয়।

—তা হোক।

—প্রথম তোমার বাড়ি আমি যেদিন এসেছিলাম, সেদিন তোমায় একটি কথা বলেছিলাম তোমার মনে আছে?

—আছে। আমায় বিয়ে করতে বারণ করেছিলেন।

—কেন করেছিলাম জানো? তোমায় প্রথম দেখেই আমার মনে হয়েছিল, যে-সব মেয়েদের আমরা গৃহলক্ষ্মী, মা বলি সে-মেয়ে তুমি নও। একজন পুরুষকে অবলম্বন করে কায়মনোবাক্যে তাকেই ভালবেসে তারই ছেলে-মেয়ের মা হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে তুমি পার না। নিত্য নূতনের অনুরাগিণী তোমার মন; ওকে এক জায়গায় বাঁধবার চেষ্টা তুমি করো না তনিমা।

তনিমা মাথা হেঁট করে নীরবে কি যেন ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ ভাববার পর মুখ তুলে বললে—আচ্ছা এমন ত হতে পারে—সত্যিকার মনের মানুষ যদি পাই তাকে নিয়েই…

কথাটা কুমার তাকে শেষ করতে দিল না। বললে—সে বড় কঠিন সাধনা তনিমা, অনেকের পর একে এসে যে থামে, বুঝতে

হবে তার চলার শক্তি তখন কমে এসেছে—সে যেন জোর করে থামা।

তনিমা বললে—তাহলে কি আপনি বলতে চান ভাগ্যে প্রথমে যে জুটবে, মেয়েরা জোর করে তাকেই ভালবাসবে?

কুমার বললে—ভালবাসার মানুষটি ত অম্‌নি চট্‌ করে সবার ভাগ্যে জোটে না তনিমা। যতদিন না জোটে মেয়েরা কি ততদিন শুধু এক হাত-থেকে আর-এক হাত, আবার সে হাত থেকে অন্য হাত, এম্‌নি করে ক্রমাগত শুধু হস্তান্তরিতা হতে হতেই চল্‌বে?

তনিমা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবল। তারপর বললে—মেয়েদের সতীত্ব কি শুধু তাদের দেহে?

কুমার এবার না হেসে থাকতে পারলো না। বললে—এই সব বড়-বড় কথা শুধু তোমরাই জিজ্ঞাসা কর তনিমা, কিন্তু আমি দেখেছি, আমি জানি, স্বামীর সহধর্মিণী হবার জন্যে যারা জন্মেছে, সন্তানের জননী যারা, গৃহের শান্তিশৃঙ্খলা মাধুর্য আর কল্যাণের ভার যাদের হাতে—এ প্রশ্ন তাদের মনে কোনদিনই হয় ত জাগে না। সতীত্ব যে নারীর কত বড় সম্পদ, তার অস্তিত্ব যে কোথায়, দেহে না মনে, তা তারা বেশ ভাল করেই জানে। কাউকে জিজ্ঞাসা করে এ-প্রশ্নের মীমাংসা করবার প্রয়োজন তাদের হয় না।

তনিমাও হাসলো। বললে—কাদের কথা বলছেন আপনি? পুরুষের গায়ে গা ঠেক্‌লে যাদের সতীত্ব যায়, তাদের কথা?

কুমার বললে—উপহাসের কথা নয় তনিমা। আমারও একদিন সেই ধারণাই ছিল। অতটা অবশ্য কেউ করে না, তুমি তাদের চেনো না। বরং তার ঠিক উল্‌টো। ধর, আজ যদি আমি তোমায় বিয়ে করি, তাহলে দেখবো তুমিও ঠিক ওইরকম করছো। কোনো পুরুষের গায়ে গা ঠেকলে শিউরে উঠে দশ হাত সরে যাবে তুমিই—ওরা যাবে না।

তনিমা বললে—ও! সেইজন্যেই বুঝি আপনি আমায় প্রত্যাখ্যান করলেন?

কুমার বললে—হ্যাঁ, ভাল হয়ত তোমায় আমার আজও যেমন লাগে, তখনও তেমনি লাগবে, কিন্তু তোমায় বিশ্বাস করতে আমি পারব না। যাক্, সে কথা নয়, বিয়ে আমি করব না। বিয়ের বয়েস আমার পেরিয়ে গেছে।

এই বলে কিছুক্ষণ থেমে কুমার আবার বললে—কিন্তু তোমারই বা আজ হঠাৎ আমার ওপর—

তনিমা বললে—হঠাৎ নয়। সেদিন একটা কথা বলেছিলাম, থিয়েটারের দরজায় সমস্ত রাত আমি অপেক্ষা করেছিলাম, কিন্তু কেন তা ত জিজ্ঞাসা করেননি।

—না, অন্যায় কৌতূহল আমার নেই।

—হয়ত আমার এ দুর্বলতা আপনার কাছে কোনদিনই আমি প্রকাশ করতে পারতাম না, কিন্তু সেদিন বড় বিপদে পড়েই ছুটে গিয়েছিলাম আপনার কাছে।

—বিপদ ?

—হ্যাঁ, আপনি জানেন দাদার গোটা সংসার চালাবার ভার আমার হাতে। তাছাড়াও আমার আরও অন্য অতিরিক্ত খুচরো খরচ-পত্র আছে, যা চালাবার জন্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আমি জানতাম অলকবাবুর অনেক টাকা আছে। প্রচুর উপার্জন তাঁর। অসৎ পথে কত টাকা উনি উড়িয়ে দেন মেয়েদের পেছনে। তাই পাঁচ হাজার টাকা আমি ওঁর কাছে ধার নিয়েছিলাম।

—পাঁচ হাজার টাকা! কুমার যেন বিস্মিত হয়।—কই এ কথা ত আগে কখনও বলোনি।

তনিমা বললে—অলকবাবুও চালাক লোক। তিনি আমার কাছ থেকে অঙ্গীকার আদায় করে নেন যে আমি তাঁকে বিয়ে করবো। আমি তখন রাজীও হয়েছিলাম, কারণ তখনও তোমাকে দেখিনি। অলকবাবু আমাকে দিয়ে একটা হ্যাণ্ডনোট সই করিয়ে নিয়েছিলেন। কারণ আমি পাছে টাকা দিতে রাজী না হই, অথচ বিয়েও না করি, এ ভয় তাঁর ছিল।

কুমার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—তারপর ?

—তারপর তিনি সম্প্রতি আমাকে ভয় দেখাতে শুরু করেছেন। বলছেন, হয় টাকা দাও, না-হয় আমাকে বিয়ে করো। বিয়ে না করলে তিনি হ্যাণ্ডনোটের টাকা আদায়ের জন্যে নালিশ করতেও পারেন বলেছেন। একথা শুনেই সেদিন রাতে আমি ছুটে গিয়েছিলাম তোমার কাছে—কারণ, অলকবাবুর চরিত্রের অনেকটাই আমি জানি।

—কিন্তু কেন তুমি এ-কাজ করতে গেলে তনিমা ?

—না করে উপায় ছিল না। তাছাড়া আমার দাদার সংসার আছে। তাঁরও টাকার প্রয়োজন। আমার সামান্য চাকরীতে অত খরচ চলতে পারে না, বুঝতেই পার।

কুমার কোন কথা বলল না।

কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে কি যেন ভাবল। তারপর বললে—তাহলে কি করবে স্থির করেছ ?

—কিছু স্থির করতে না পেরেই গিয়েছিলাম তোমার কাছে।

কুমার ভাল করে তাকালো তনিমার মুখের দিকে। দেখলো তনিমার চোখে জল।

—তুমি কাঁদছো তনিমা ?

তনিমা কোনও উত্তর দিল না। কুমারকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তার কোলের ওপর মাথা রেখে কাঁদতে থাকে।

কুমার কোনও কথা বলতে পারে না। তনিমার হাত কিম্বা মাথা কোনটাই সে সরিয়ে দিতেও পারে না।

একটা অভূতপূর্ব বিরাট সমস্যা যেন সাময়িকভাবে তাকে বিমূঢ় করে তোলে।

॥ পনেরো ॥

শহরের পথে তখন আলো জ্বলে উঠেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার বীণাদের ঘরের মধ্যেও এত বেশি ঘনিয়ে উঠেছে যে, সেখানেও আলো জ্বালার প্রয়োজন।

বেচারা বীণা!

দিনরাত এত বেশি সাবধান-সতর্ক হয়ে থাকে, তবু যেন তার নির্যাতনের আর শেষ নেই।

দোষের মধ্যে সেদিন সে নিচে নেমে আসছিল, ঠিক সেই সময় তাদের বাড়ির ভাড়াটে অমূল্য ছোকরা তার দিকে আনমনাভাবে তাকিয়ে দেখছিল। সেটা হঠাৎ গণপতির নজরে পড়ে যায়।

তার পর থেকেই গণপতি যেন কেমন হয়ে গেছে! বীণাকে দিনরাত এ নিয়ে কথা শুনতে হচ্ছে।

অথচ বীণা জানে, অমূল্য ছেলেটি তার সঙ্গে কখনও কোনও অসদাচরণ করেনি, বা কোনও কু-অভিপ্রায় তার কখনো নেই। চরিত্রহীন লোকেদের বীণা চেনে—তাদের বিষয়ে তার আতংকের অন্ত নেই। কিন্তু অমূল্য যে সে-জাতের নয়, তা সে কেমন করে বোঝাবে তার স্বামীকে!

দিনরাত গণপতি বাড়িতে বসে থাকে।

সব সময় সে বীণাকে যতটা সম্ভব চোখে-চোখে রাখে। ছদিন অন্তর সে একবার করে বাড়ির বাইরে যায়—তাও আবার মিনিট কয়েকের জন্যে। বাড়ির ঝি তামাক ভাল কিনতে পারে না, তাই তাকে নিজে গিয়ে বাজার থেকে তামাক, টিকে কিনে আনতে হয়। একেবারে ছদিনের মত তামাক কিনে আনে।

যাবার সময় বীণাকে কাছে ডেকে বলে—এই!

হেঁটমুখে বীণা তার কাছে এসে দাঁড়ায়।

গণপতি কোন দিন তার হাত ধরে, কোন দিন-বা মাথার চুল টেনে দিয়ে বলে—শুনছিস্? না—আমার কথাগুলো তোর কানে যায় না?

বীণা ঘাড় নেড়ে বলে—শুনছি।

গণপতি বলে—বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছি, ঘরে কেউ নেই, একা ঘর—বুঝলি ত?

বীণা ঘাড় নেড়ে বলে—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ কি রকম? হ্যাঁ মানে?

বীণা কি তার জবাব দেবে? চুপ করে থাকে।

গণপতি বলে—টেক্ কেয়ার! খুব সাবধান।

নীরবে ঘাড় নেড়ে বীণা তার সম্মতি জানায়। কথা বলতে তার ভয় করে।

গণপতি কিন্তু তাকে ছাড়ে না। চিবুকে একটা ঠেলা দিয়ে মুখখানা তার সোজা করে বলে—কেন, কথা কইতে জানো না? কথা কও বলছি। কথা কও!

সজল চোখ দুটি তুলে বীণা তার মুখের পানে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। দু-একবার ঢোঁক গিলে কথা বলবার চেষ্টাও যে করে না তা নয়, কিন্তু রুদ্ধকণ্ঠে সহজে তার কথা সরে না।

গণপতি কৃত্রিম রাগের ভান করে বলে—তবে এই আমি চললাম বাড়ি থেকে বেরিয়ে। আর ফিরব না, বলে দিচ্ছি।

বীণার মাথাটা ঝন্ করে ওঠে। যদি সত্যিই চলে যায়? অভিমান করে সত্যিই যদি আর না ফেরে? প্রাণপণ শক্তিতে ছুটে গিয়ে বীণা তার কাপড় ধরে টেনে আনে। কাঁদতে-কাঁদতে বলে—যেয়ো না।

তার বেশি আর কিছু বলতে পারে না সে।

গণপতি হেসে ফেলে। বলে—তবে? হেঁ-হেঁ, সেই আমি ছাড়া গতি নেই। অমন্ মুখ-গোমড়া করে থেকো না বলছি। মুখে তোমার সে হাসি কই? হাসো। হাসো বলছি। এই নাও, তবে এই বসলাম।

বলে গণপতি আবার তার সেই প্রাচীন তক্তাপোষের ওপর বসে পড়ে। বীণার হাত ধরে তাকে কাছে টেনে এনে বলে—মুখে তোমার হাসি না দেখে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি না বাবা। হাসো।

বীণার চোখের জল তখনও শুকোয়নি। তবু তাকে হাসতে হয়। তার সেই আরক্তিম সুচারু দুটি ঠোঁট ঈষৎ বিস্তৃত করে অতি সকরুণ একটুখানি হাসি হাসে। মুক্তোর মত শুভ্র সুবিন্যস্ত দন্ত-পঙ্‌ক্তি দেখা যায়। রক্তাভ গালে একটুখানি টোল পড়ে। তা দেখে গণপতি আর স্থির থাকতে পারে না। বীণাকে তার বুকের ওপর টেনে এনে চুম্বন করে বলে—বলি কি তোমায় সাধে বীণা, তোমায় বড্ড ভালবাসি যে।

বীণার অতবড় দুঃখ নিমেষেই যেন অন্তর্হিত হয়ে যায়। চোখ দিয়ে দর্‌দর্‌ করে অশ্রু গড়ায়।

কাঁদতে-কাঁদতে সে গণপতির গলা জড়িয়ে ধরে বলে—বাসো? সত্যি ভালবাসো?

গণপতি ঘাড় নেড়ে বলে—ইয়েস্‌।

বলেই সে উঠে দাঁড়ায়। দরজার কাছে গিয়ে বলে—তামাক নিয়ে আসি। বাট্‌ ইউ টেক্‌ কেয়ার! আমি বড় ভীষণ লোক।

বীণা ঈষৎ থেমে বলে—না।

গণপতি দরজার কাছে আবার থম্‌কে দাঁড়ায়। বলে—না বললে যে! কি বুঝলে বল ত?

বীণা দিব্য সহজকণ্ঠে বলে—বুঝলাম, কলতলায় যেতে তুমি বারণ করেছ, ওদিক আর মাড়াব না।

—বেশ, বেশ, তাই ত বলি, তুমি বোঝ সব তবু কেন—

বলতে-বলতে খুশী হয়েই এতক্ষণ পরে তামাক কেনার জন্যে ঘর থেকে সে বেরিয়ে পড়ে।

এম্‌নি করে দিনের-পর-দিন কাটে।

গণপতি কখনও রাগ করে, সন্দেহ করে, বেচারা বীণাকে বকে-

ঝকে, অপমান করে, সাবধান করে একেবারে নাস্তানাবুদ করে তোলে, আবার তখনই হয়ত বীণার মুখখানি দেখে আর চুপ করে থাকতে পারে না। তাকে কাছে ডেকে আদর করে, সোহাগ করে তাকে হাসাবার চেষ্টা করে।

প্রথম দিন সেই যে সে বীণাকে বকে কাঁদিয়েছিল, তারপর বোধ হয় তনিমার ভয়েই আর বেশি হৈ চৈ সে কখনও করে না। কিন্তু আজকাল ধীরভাবে সে যে তীক্ষ্ণ চোখা-চোখা বাক্যবাণে তাকে বিদ্ধ করে তার জ্বালা বোধ আরও অনেক বেশি দুঃসহ।

তনিমার কথা মনে হয়। মনে হয় তনিমার কথা না শোনার জন্যেই তার আজ এত বিপত্তি। দোষ সে করেছে বই-কি।

কিন্তু তনিমাই কি তার একটা-কিছু উপায় বলে দিতে পারে না? কিন্তু তনিমাকে যে একা পায় না কখনো। হয় তার ঘরে অলকবাবু, না-হয় কুমারবাবু থাকেন।

সেদিন হঠাৎ সকালে বের হবার সময় তনিমা তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে—কেমন আছিস্ ভাই? কদিন ধরে কাজে এত ব্যস্ত হয়ে রয়েছি দেখতেই ত পাচ্ছিস। তারপর? দাদা আর গালাগালি করে না ত?

হেসে বীণা বললে—না।

—না, আর করবে না। থাক ভাই, তোরা দুটিতে সুখে থাক্। ছেলে হোক, মেয়ে হোক, ঘরকন্না হোক, আমি দেখি।

বীণা ভাবে, সেই ভাগ্য কি তার হবে? তার ছেলে হবে মেয়ে হবে, স্বামীকে নিয়ে সুখে সংসার পাতবে, ছেলে-মেয়ে তাকে মা বলে ডাকবে···

আনন্দে উচ্ছ্বাসে যেন বীণার বুক ভরে ওঠে।

গণপতি সেদিন আর থাকতে না পেরে এক কাণ্ড করে বসলো।

দুদিনের তামাক ফুরোবার পর সেদিন আবার সে তামাক কিনতে গিয়েছিল। পথে তাদের সেই ভাড়াটে ছোকরা অমূল্যর সঙ্গে দেখা।

শীর্ণ কঙ্কালসার চেহারা, গায়ের রং ফর্সা, পরণে একখানা সেলাই-করা ছেঁড়া ময়লা কাপড়, গায়ে একটি সাবান-কাচা টুইলের সার্ট, বোতাম অভাবে বুকের কাছটা একটি সেফ্‌টিপিন দিয়ে আঁটা, পায়ে সস্তা স্যাণ্ডেল।

গণপতিকে দেখেই সে হেসে বললে—কেমন আছেন দাদা?

—হুঁ, বলে গণপতি একটু গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—শোন!

অমূল্য থম্‌কে দাঁড়ালো।

গণপতি বললে—ছ্যাখো, বাড়ি তোমাদের ছেড়ে দিতে হবে।

অমূল্য যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লো।

একটা ডাক্তারখানায় সে সামান্য বেতনে চাকরী করে, ছমাসের মাইনে এখনও বাকি। ডাক্তারখানার যিনি মালিক তিনি কি একটা কাজে দেশে চলে গেছেন। তার ওপর বাড়ি ছাড়ার এই সর্বনাশা হুকুম! অমূল্যর আকাশ থেকে পড়বারই কথা।

গণপতির দিকে চেয়ে দেখল, তার চেহারার মধ্যে করুণার লেশমাত্র নেই।

কথা বলতে তার ভয় হচ্ছিল, তবু ভয়ে-ভয়ে নিতান্ত সংকুচিত ভাবে বললে—দেখুন, এ সময় বাজার বড় খারাপ দাদা! এ সময় যদি···আমি এত দিনের ভাড়াটে···দয়া করে···

গণপতির মুখের চেহারা আরও রুক্ষ হয়ে উঠল। বললে—আমি সব জানি।

এবারে অমূল্য যেন আশ্বস্ত হয়ে বললে—যদি সব জানেনই দাদা, তাহলে ত বুঝতেই পারছেন বাজারের অবস্থা। আমাদের কত্তাবাবু দেশে চলে গেছেন—

কথাটা তাকে শেষ করতে না দিয়েই গণপতি সেই পথের মাঝেই হুংকার দিয়ে উঠলো—চোপ্‌ হারামজাদা পাজি—

বেচারা অমূল্য ত ভয়ে কাঠ!

রাস্তায় লোক জমে উঠছিলো। গণপতি বললে—চালাকি আমার কাছে চল্‌বে না, তা জানিস্? আই স্যাল্ কিল্ ইউ!

বলেই সে হন্ হন্ করে বাড়ির দিকে চলে গেল।

হাঁ করে অমূল্য সেই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল।

চোখ দুটো তার অশ্রুতে ভরে এলো। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে সে এক পা এক পা করে ডাক্তারখানার দিকে চলল।

চলতে লাগলো বটে, কিন্তু তার বুকের ভেতরটা যেন তোল-পাড় করছিল। জীবনে সে কখনও কারো কাছে এ-রকম দুর্ব্যবহার পায়নি। গণপতিও এতকাল তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে এসেছে। আজ সে ওরকম করল কেন কে জানে! মাথা কি তার আরও খারাপ হয়ে গেছে?

ডাক্তারখানায় গিয়ে দেখল কত্তাবাবু সেদিনও আসেনি। বড়বাবুর কাছে টাকা চাইতে গিয়ে ধমক খেয়ে ফিরে এলো। কাজে সেদিন ভাল মন বসল না। খদ্দেরকে এক জিনিস দিতে আর এক জিনিস দিয়ে সেদিন তার আর লাঞ্ছনার বাকি কিছু রইলো না। তার ওপর ক্রমাগত তার মনে হতে লাগল—গণপতির সেই উগ্রমূর্তি—পথের মাঝে সেই অপমান।

হঠাৎ এক সময় তার মনে হলো, ডাক্তারখানায় বিষ পাওয়া যায়, সেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলে কেমন হয়! কিন্তু তখনি মনে পড়ল তার বুড়ো বধির মায়ের কথা। মা থাকতে আত্মহত্যা সে করতে পারবে না। একমাত্র ছেলে হারিয়ে মার মনে যে ব্যথা বাজবে তা যেন সে অনুভব করে শিউরে উঠল।

সেদিন রাত্রে ডাক্তারখানা থেকে বাড়ি ফিরবার সময় সারা পথটাই সে তার মায়ের মৃত্যুকামনা করতে-করতে বাড়ি ফিরল। মা আগে মরুক তারপর নিজে সে একেবারে স্বাধীন হয়ে প্রাণপণে নিজের অবস্থাটা একবার ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করবে। না পারে ওই দুঃখ-দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনের ওপর শেষ যবনিকা টেনে দিতে তখন আর তার বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না। একফোঁটা চোখের জল ফেলবার লোক যার নেই তার আর মরতে দুঃখ কি।

। ষোলো।

অলক প্রথমে কিছুতেই রাজি হয়নি, শেষে অনেক কষ্টে তনিমা তাকে রাজি করিয়েছে।—আরও দু'দিনের সময়।

তনিমা বললে—ছাখো, বিয়ে তোমায় আমার করতেই হবে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আরও দু'দিন সময় আমি চাই।

—এখনও সময়?

—হ্যাঁ। বলে ঘাড় নেড়ে সম্মতির অপেক্ষায় তনিমা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অলক বললে—আচ্ছা দিলাম সময়। কিন্তু এদিকে বিয়ের সব প্রস্তুত সে-কথা যেন মনে থাকে।

—থাকবে। বলে তনিমা ঘাড় নেড়ে একটু হেসে অলককে মোটরে চড়িয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকছিল, এমন সময় তারই ভাড়াটে অমূল্য হাত জোড় করে নিতান্ত বিষণ্নমুখে তার কাছে এসে দাঁড়াল।

—আমাদের কি আপনি তুলে দেবেন দিদিমণি?

ব্যাপারটা তনিমা ভাল বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—কেন?

অমূল্য বললে—দাদাবাবু কাল আমায় বলেছেন উঠে যেতে, আজ সকালে আবার এই নোটিশখানা—

বলে তার কাপড়ের ভেতর থেকে বের করে অতি সঙ্গোপনে ভাঁজ করা একখানি কাগজ সে তার হাতে দিয়ে বললে—পড়ে দেখুন।

তনিমা দেখল হাতের লেখা গণপতির। আগাগোড়া ভুল ইংরাজীতে লেখা; তা ছাড়া নোটিশে সে অনেক কথাই লিখেছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে উঠে যাবার জন্য তোমাকে তিন-

দিনের বেশি সময় কিছুতেই দেওয়া হবে না, কারণ যে অপরাধ তুমি করেছ তাতে ঘাড়ে ধরে এক্ষুনি তোমাকে বের করে দেওয়াই ছিল আমার কর্তব্য, যাই হোক, তিন দিন পরেও যদি না যাও, তা হলে জোর করে তোমাকে তুলে দিতে ত হবেই, এমন কি তোমার অপরাধের জন্য কোর্টে মামলা রুজু করে দিতেও পারি। তাতে তোমার জেল অনিবার্য।

বেচারা অমূল্যর মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

ঘরে ঢুকে তনিমা ডাকল, দাদা।

গণপতি বোধহয় তামাক টানছিল, গড়গড়ার শব্দে প্রথমে শুনতে পায়নি। হাসতে-হাসতে বীণা প্রথমে ঘর থেকে বের হয়ে এল এবং তার পেছনে দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে গণপতি বললে—কি!

—অমূল্যদের তুমি উঠে যেতে বলেছ?

গণপতি ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ। নোটিশ দিয়েছি।

উঠে যেতে বলার কারণ তনিমা জানে। —আহা বেচারা তাতেই যদি সুখী হয় ত হোক।

কি আর করবে, কিছুক্ষণ ভেবে তনিমা মুখ ফিরিয়ে অমূল্যকে বোধহয় তাদের উঠে যাবার কথাটাই বলতে যাচ্ছিল, দেখল অমূল্য চোখের জলটাকে বৃথাই গোপন করবার চেষ্টা করছে আর ডান হাতের আঙুলের একটি নখ দিয়ে দেওয়ালের একটুখানি চুণ ছাড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

তনিমার দয়া হলো। বললে—কলকাতায় বাড়ির অভাব কি অমূল্য, তবে হ্যাঁ অনেক দিন ছিলে আমাদের সঙ্গে কেমন যেন মায়া বসে গেছে, ছাড়তেও কষ্ট হয়। তা আর করবে কি বল। তোমরা ত আর নিজে উঠে যাওনি, আমরাই উঠিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে সে চলে যাচ্ছিল, অমূল্য তার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ প্রাণপণে একবার পরিষ্কার করে নিয়ে ডাকল—শুনুন।

—আমায় ডাকছ? বলে তনিমা ফিরে দাঁড়াল।

অমূল্য বললে—আমাদের ত এখন যাওয়া হবে না।

তনিমা জিজ্ঞাসা করল—কেন?

অমূল্য বললে—আমাদের দু' মাসের ভাড়া বাকি, তাছাড়া আমাদের ডাক্তারখানার কত্তাবাবু—

এবার গণপতি তার ঘর থেকে চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।—বললে—শোন্ তনিমা শোন্! না যাবার ফন্দিটা ছাখ একবার। হেঁ-হেঁ বাবা আমি জানি না তুমি কেন যেতে চাচ্ছ না?—আর ওই ছাখ্। বলে আঙুল বাড়িয়ে ওদিকে দেওয়ালের কাছে বীণাকে দেখিয়ে দিয়ে বললে—সেই থেকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ড্যাব্ ড্যাব্ করে তাকাচ্ছে। আমি কিছু বলিনি, বলি দেখি না শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখবার প্রয়োজন হলো না। কথাটা শুনে মাত্র বীণা সেখান থেকে ছুটে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেল। ওই শীর্ণকায় নিতান্ত নিরীহ ছেলেটির চরিত্রে স্বামী যে তার কলঙ্ক লেপে দিয়েছে সেকথা এতক্ষণ তার মনেই ছিল না। অমূল্যকে এত ভাল করে অন্যদিন সে দেখেনি, আজ তার সেই অশ্রুসজল অত্যন্ত অসহায় কাতর মুখখানি দেখে বীণার মনে কেমন যেন মমতা জেগেছিল তাই সে অমন করে সব-কিছু ভুলে গিয়ে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে তারই মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তনিমা বললে—কি যে বল দাদা! আচ্ছা দাঁড়াও সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এসো ত অমূল্য, শোন।

বলে গণপতির কাছ থেকে তাকে ওপরে উঠবার সিঁড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে তনিমা চুপি-চুপি বললে—ভাড়া তোমায় দিতে হবে না। যেখানে হোক একটি ঘর দেখে তোমরা উঠে যেও। কেমন?

জবাবে অমূল্যর মুখ দিয়ে আর কথা বের হলো না। আবার একটা ঢোক গিলে সে একবার তনিমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে পাশের দরজা দিয়ে তাদের ঘরে চলে গেল।

তনিমা ওপরে উঠে গিয়ে দেখে বীণা তারই অপেক্ষায় দরজার

পাশটিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। হাত ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে বললে—বোস, কদিন তোর সঙ্গে ভাল করে কথা কইতে পারিনি।

বলে সে সোফার ওপর নিজেও বসল। বললে—যাঃ কাঁটা তোর দূর করে দিলাম। এবার আর সন্দেহ করবার কিছু থাকবে না, তোরা দুই স্বামী-স্ত্রীতে খুব সুখে থাকবি।

কথাটার কিছুই সে বুঝতে পারল না। তনিমাকে কয়েকদিন ভালো করে দেখেনি। আজ কাছে পেয়ে তাই সে তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল, বললে—কি ?

তনিমা হেসে বললে—তোর মাথা।

স্বামী-স্ত্রীতে সুখে থাকবার কথাটা মাত্র সে শুনেছিল। সেও একটু হেসে তনিমার হাতখানা চেপে ধরে বললে—কি বললি ভাই ? আমরা সুখে থাকব ? সে কি আমার অদৃষ্টে হবে ?

আজ আর তর্ক করে বুঝাবার মত মনের অবস্থা তনিমার ছিল না। তাই সে শুধু ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ হবে। অমূল্যদের যাবার সব ব্যবস্থা করে দিলাম। বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বীণার মুখের দিকে তাকিয়ে তনিমা বললে—দু একদিনের মধ্যেই এ পাপ তোদের কাছ থেকে বিদায় হয়ে যাবে।

কথাটা বীণা বিশ্বাস করলে না। বললে—যাঃ।

—যা নয় বীণা, সত্যি। আমি বিয়ে করব।

—সত্যি ? কাকে ? কবে ? সত্যি, না তোর মিছে কথা !

—সত্যি, আমি অলকবাবুকে বিয়ে করব। কেমন, ভালো বর হবে ?

বীণা বললে—বেশ মানাবে। আমি ত তাই বলছিলাম যে বিয়ে কর—

তনিমা উত্তর না দিয়ে ঘরের মধ্যে ইতস্তত পায়চারী করতে লাগলো।

বীণা বললে—ছট্‌ফট্‌ করছিস যে ? বোস, দুটো কথা বলি।

—কথা। হ্যাঁ, বল্। আমি একটা লোকের জন্য ছটফট্ করছি। দাঁড়া দেখি এলো কিনা। লোকটার কি সময়েরও জ্ঞান নেই?

—কে তনিমা?

—কে আবার। বল্ ত কে?

বীণা বললে—কি জানি ভাই, তোর ত আর লোকের অভাব নেই। আচ্ছা তনিমা, তোর বেশ অভ্যেস হয়ে গেছে, না? ব্যাটা-ছেলেদের কাছে দাঁড়াতে তোর গা ছম্-ছম্ করে না?

তনিমা তাচ্ছিল্য করে বললে—না। আচ্ছা, বামুনঠাকরুণ এসেছে? রান্না হচ্ছে?

—হ্যাঁ, হচ্ছে ত।

—যা ত ভাই, ওকে বলে আয় আজ রাতে কুমারবাবু খাবেন এখানে। বেশ ভাল করে রান্না-বান্না যেন করে। কিছু আনতে যদি হয় ত যেন টাকা নিয়ে যায় আমার কাছ থেকে।

বীণা গেল রান্নাঘরে। কিছুক্ষণ পরেই হাসতে-হাসতে ঘরে ঢুকল কুমার।

তনিমা বললে—আসুন। আপনার না পাঁচটার পরেই আসবার কথা? আপনি আসবেন বলে আর-একজনকে আসতে না আসতেই বিদায় করলাম।

কুমার বললে—ভাল। আমার ওপর তোমার অনুগ্রহ তাহলে এখনও তেমনি প্রবল বলতে হবে। কিন্তু কাল তোমার বিয়ে। নেহাৎ কথা দিয়েছিলাম তাই এলাম, নইলে—

তনিমা বললে—আসতে ভয় করে বুঝি?

ঘাড় নেড়ে কুমার বললে—হ্যাঁ, ঠিক তাই। যাক্—আজই হয়ত আমাদের শেষ দেখা।

তনিমা হেসে বললে—বেশ ত! তার জন্যে ত অনুতাপের কিছু নেই কুমারবাবু। বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

কুমার ধীরে-ধীরে বসলো।

বললে—অনুতাপের ত কিছু নেই তনিমা, কিন্তু তুমি শেষে

বিয়ে করবে? না, বিয়ে করা বোধ হয় তোমার জীবনের একটা মস্ত বড় ভুল হবে।

তনিমা বললে—এ নিয়ে ত সেদিন অনেক আলোচনা হয়ে গেছে, অনেক অপমান আপনি আমায় করেছেন, আর না। আপনি বলে তাই রক্ষে, অন্য কেউ হলে তাও সহ্য করতাম না।

বলেই সে দরজার বাইরে বীণাকে দেখতে পেয়ে বললে—আয় না বীণা, অত লজ্জা কিসের?

বাইরে থেকে ঘাড় নেড়ে না বলে বীণা চলে গেল।

তনিমা হেসে বললে—দাদা আমার বারণ করে দিয়েছে ওকে পরপুরুষের সামনে বেরোতে। তাই ও আর আপনাদের সামনে আসবে না।

কুমার বললে—ভাল।

—ভাল? তার মানে? বাপ্‌রে বাপ্, বিয়ের পর আমার ওপর যদি এই আদেশ হয় ত আমি আত্মহত্যা করব।

কুমার হাসলো। বললে—আদেশও হবে, তুমি আত্মহত্যাও করবে না।

—কি করব তাহলে? স্বামীর সে আদেশ মেনে নেবো?

—মানতে পারবে না বলেই ত ভয়।

—অথচ আদেশ তিনি করবেন?

—নিশ্চয় করবেন।

—কেন?

কুমার একটু হেসে বললে—কেন করবেন জানতে চাও? বিয়ের পর তুমি হবে তোমার স্বামীর সম্পত্তি। মানুষ চায় না যে তার সম্পত্তি চোরে চুরি করে নিক্, তাই সে তার সম্পত্তি আগলে রাখে।

তনিমা জিজ্ঞাসা করলে—আগলাবার ক্ষমতা যদি তার না থাকে?

কুমার বললে—যাবে চুরি। যেদিন সে বুঝবে সত্যিই চুরি গেছে বুদ্ধিমান যদি হয় ত সে নিজে সেখান থেকে সরে দাঁড়াবে, সম্পত্তির

ওপর আর কোনও দাবী-দাওয়াই রাখবে না, আর নির্বোধ যদি হয় ত সে চোর এবং সম্পত্তির দুইএর ওপর রাগ করে অভিমান করে আজীবন জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাবে।

তনিমার ঠোঁটে একটুখানি নীরস নিষ্ঠুর শুষ্ক হাসি দেখা দিল। দাঁতে দাঁত চেপে বললে—তাই চাই আমি। জ্বলুক সে, জ্বলে-পুড়ে মরুক।

কুমার বললে—আজ একথা বললে চলবে কেন তনিমা? একদিন ত নিজে থেকে ধরা দিয়ে নিজের বাঁধন নিজে কিনেছ।

তনিমা বললে—বেশ করেছি। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কি সম্বন্ধ?

—অঙ্গীকার করেছ, সেই তারই সম্বন্ধ।

তনিমা দাঁত দিয়ে তার নীচেকার ঠোঁটের একটুখানি চেপে ধরে কি যেন ভাবল। বললে—ভুল করেছি, না? আচ্ছা আমি ত ভুলের দাম দিতে চলেইছি, সেও দিক। জানুক যে, কাগজ-কলমের চুক্তিতে আর সব বাঁধা যায়, মানুষের মন বাঁধা যায় না।

বলে সে উঠে দাঁড়ালো।

কুমারও হেঁটমুখে বসে কি যেন ভাবছিলো।

দুজনেই চুপ!

তনিমা ঘরের মধ্যে একবার খাটের কাছে, একবার জানলার কাছে, একবার আর্শীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। একবার বাইরে গেল, তারপর ভেতরে ঢুকে হাসতে-হাসতে বললে—কি ভাবছেন?

—ভাবছি তোমার ওই মনটিকে এক জায়গায় বাঁধবার মত কোনও বস্তু এ পৃথিবীতে আছে কি না।

তনিমা বললে—তারপর? ভেবে কি ঠিক করলেন?

কুমার বললে—এম্‌নি আরও দু তিনটি মনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার, কিন্তু সেখানেও যেমন ভেবে কিছু কূল-কিনারা পাইনি, এখানেও তেমনি কিছু পাচ্ছি না।

—পাবেন না। আর আপনার ভেবেই বা লাভ কি?

বলে খুব খানিকটা হেসে তনিমা তার কাছে এসে দাঁড়ালো।

কুমার মুখ তুলে তার মুখের দিকে তাকাতেই তনিমা তার পায়ের কাছে কার্পেটের ওপর বসে পড়ে নিতান্ত ছেলেমানুষের মত আবদারের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলে—আচ্ছা আপনি ঠিক আমার মত আরও মেয়ে দেখেছেন ?

কুমার বললে—দেখেছি।

—ঠিক আমার মত ?

—হ্যাঁ, ঠিক তোমার মত। এত সুন্দরী না হলেও, তোমার মত।

—আমি তাদের সকলের চেয়ে সুন্দরী ?

কুমার নীরবে ঘাড় নাড়ল।

—তাদের কাছে আপনি খুব আঘাত পেয়েছেন না ?

কুমার বললে—হ্যাঁ, পুরুষকে আঘাত ছাড়া আর কিছু তারা দেয় না।

তনিমা কেমন যেন একটুখানি বিস্মিত হলো। বললে—বলেন কি ? তা ছাড়া আর কিছু কি তাদের দেবার নেই ?

কুমার বললে—হয়ত আছে। কিন্তু তার সন্ধান তারা নিজেরাই সহজে পায় না। অন্তত ততদিন পায় না—যতদিন না তারা নিজেরাই অন্যের কাছ থেকে কঠোর আঘাত পেয়ে চম্‌কে না ওঠে।

তনিমা কি যেন ভাবল। ভেবে বললে—আচ্ছা, তবে জেনে-শুনে আঘাত পাবার জন্যে আপনি আমার কাছে আসেন কেন শুনি ?

—আঘাত পাবার জন্যে আসি না।

—তবে কি জন্যে আসেন ?

—নিজেই বুঝি না।

—আচ্ছা সে-কথা আজ আপনাকে আমি বুঝিয়ে দেবো।

বলে আবার তনিমা উঠে দাঁড়ালো। হাসতে-হাসতে বললে—স্ত্রী স্বামীর প্রপার্টি না কি বললেন ? হ্যাঁ। সম্পত্তি। আপনি জানেন কি, আমার যিনি স্বামী হতে চললেন, কোন্ চোরের হাত থেকে সবার আগে তাঁর সম্পত্তি তিনি আগ্‌লাতে চান ?

কুমার বললে—আজ তোমার কি হয়েছে বল ত তনিমা? অমন করছ কেন? কি-সব বলছ যা-তা?

তনিমা বললে—যা-তা নয়। যে চোর, সে চোর—তুমি, তুমি, তুমি।

বলে তনিমা তার বাঁ-হাত দিয়ে আলোর স্থইচটা নিবিয়ে ঘরটা প্রথমে অন্ধকার করে দিল। তারপর ঠিক একেবারে উন্মাদিনীর মত কুমারের গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ছুটি স্থকোমল সুদৃশ্য বাহু দিয়ে সজোরে তার কণ্ঠদেশ আলিঙ্গন করে বলে উঠল—সেই চোরের হাতেই আমি আমার সর্বস্ব সমর্পণ করলাম। শক্তি থাকে, প্রত্যাখ্যান করে জন্মের মত চলে যাও, আর যেন এসো না।

॥ সতেরো ॥

তারপরেই বিয়ে।

কুমার তাকে এত করে নিষেধ করল, অলকবাবুকে তুমি বিয়ে করো না তনিমা! তার চেয়ে এখান থেকে পালাও তুমি কিছুদিনের জন্যে। কী আর ও এমন করবে তোমার? শোন আমার কথা।

কিন্তু কি যে সে বুঝল সে-ই জানে। ঘাড় নেড়ে বললে—না।

সমস্ত রাত্রিটা কুমার সেইখানেই কাটাল। উদ্দাম উন্মত্ত রাত্রি কখন প্রভাত হয়ে গেছে কেউই জানে না।

প্রভাতে কুমারের আবার সেই অনুরোধ—বিয়ে তুমি করো না লক্ষ্মীটি!

—না করে উপায় কি? টাকা?

টাকার কথাটা কুমারের এতক্ষণ মনেই ছিল না। বললে—না।

বলে সে নীরবে কিছুক্ষণ বসে থেকে জামা-জুতা পরে বের হয়ে যাচ্ছিল। তনিমা ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে আঁচলটা

মেঝের ওপর দিয়ে টানতে-টানতে দরজার কাছে এসে তাকে আটকালো। বা-রে, একটুখানি চোখ বুজেছি আর পালাবার ব্যবস্থা!

—হ্যাঁ, আমি—আমার অনেক কাজ আছে।

বলে নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত তনিমাকে হাত দিয়ে একটুখানি সরিয়ে দিয়ে কুমার তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেল। যাবার সময় তনিমার মুখের দিকে একবার ফিরেও তাকাল না।

দরজার চৌকাঠ ধরে তনিমা ঠিক নিশ্চল মূর্তির মত নির্বাক নিস্তব্ধ ভাবে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর জুতোর শব্দ নিচু থেকে যখন কানে গেল না, তখন সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার তার সেই পরিত্যক্ত শুভ্র বিছানায় গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

বেচারা অমূল্য যে কি কষ্টে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে তা আমরা জানি।

মা তার কানে ভাল শুনতে পায় না। এক বললে এক শোনে। যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অমূল্য তাকে কোনও কথাই শোনায়নি। শুধু মার কাছ থেকে তার অমতে বাবার সোনার আংটিটি চেয়ে নিয়ে সকালে উঠে সেটা বিক্রি করে দিয়ে কিছু টাকা সংগ্রহ করে এনেছিল।

বেলা দশটা নাগাদ হঠাৎ কোত্থেকে ঘুরে এসে বললে—মা, চল, একটা খুব ভাল বাড়ি পেয়েছি।

মা একেবারে অবাক হয়ে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে—সে কি রে! বলা নেই, কওয়া নেই, চললাম কি রে?

অমূল্য বললে—হ্যাঁ বলেছি, চল।

মার কেমন যেন সন্দেহ হল। চুপিচুপি ছেলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কিছু কাণ্ড-ফাণ্ড করিসনি ত বাছা! বল্ তাহলে তনিমাকে শুধোই না-নয়।

বিছানার বাণ্ডিলটা দড়ি দিয়ে বাঁধতে-বাঁধতে অমূল্য হাত নেড়ে

মাকে তার বুঝিয়ে দিল যে, না, এমন কোনও কাণ্ড সে করে বসেনি, যার জন্যে এমন করে চোরের মত পালিয়ে যেতে হবে। তনিমা তাদের যেতে বলেছে।

এতদিনের বাড়ি ছেড়ে যেতে মার মনে কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। বললে—তোর যা খুশী কর্ বাছা, তবু আমি একবার তনিমাকে শুধিয়ে আসি।

বলে সে ওপরে উঠে গিয়ে ত্যাখে, তনিমা তখনও ঘুমোচ্ছে।

দরজায় অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে নিরাশ হয়ে নিচে নেমে গিয়ে ছেলেকে আবার জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে দেখে, ঘরের যৎসামান্য জিনিসপত্র ইতিমধ্যে সবই সে গাড়িতে তুলেছে।

মা জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ রে অমূল্য, ভাড়া সব চুকিয়ে দিয়েছিস্ ত?

—হ্যাঁ।

—কেমন করে দিলি? মাইনে ত এখনও—

বলেই হঠাৎ কালকের কথা মনে পড়তেই বললে—দেখি তোর হাতের আঙুলটা।

দেখলে আংটি নেই।

সোনা বলতে বাড়িতে এই আংটিটি মাত্র সম্বল ছিল। এটি অমূল্যের বাবার স্মৃতি বলে নিতান্ত দুঃখের দিনেও কোনপ্রকারেই হাতছাড়া করেনি। আজ তাই কিনা—

মার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো।

হায়-হায় করে চীৎকার করে সেইখানেই সে কাঁদবার উপক্রম করছিল, অমূল্য তার হাত ধরে একরকম জোর করেই তাকে গাড়িতে তুলে বললে—চালাও!

মার চোখ দিয়ে তখন ঝরঝর করে জল ঝরছে।

তা দেখে অমূল্যরও চোখ দুটো জলে ভরে এলো।

সজল চোখে তার একখানা হাত ধরে বললে—চুপ কর মা!

মা তার হাতখানা রাগ করে সরিয়ে দিয়ে বললে—তুই আর

কথা বলিস্‌নে হতভাগা, তুই এত মন্দ হয়েছিস্? ছি! চারদিন উপোস করে পড়েছিলাম, তবু তোর বাবার ওই আংটিটি আমি হাত থেকে খুলিনি, আর তুই কিনা সেই আংটিই ঘুচিয়ে এলি? এমন করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ছাড়বার কি এমন তোর দরকার পড়ল শুনি? কোন মাতাল বদমায়েস বন্ধুর পাল্লায় পড়ে বুঝি—

মা তার এম্‌নি বকতে-বকতে চলল।

চলন্ত গাড়ির ওপর থেকে কোচম্যান হাঁকল—কোথায় যেতে হবে বাবু?

চোখের জল মুছে অমূল্য বললে—হাতিবাগান।

ঝম্ ঝম্ করে ঘোড়ার গলার ঘুঙুর বাজিয়ে গাড়ি চলতে লাগল।

গণপতির শঙ্কা-সন্দেহের আর কোনও কারণ নেই।

বীণার মুখে তনিমার বিয়ের খবর সে পেয়েছে।

শুনে গণপতির আনন্দের আর সীমা নেই। তক্ষুনি গণপতি কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে একটা প্রীতি-উপহার লিখতে বসে গেছে।

কিন্তু সেটি যেন আর শেষই হয় না।

গণপতি তার গড়গড়ায় একটা টান দিয়ে বীণার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে-হাসতে বললে—এ কি সহজ কথা নাকি! আমি বলেই তাই এতটা লিখে ফেললাম, অন্য কেউ লিখুক দেখি! অনেকদিন প্র্যাক্‌টিশ নেই কিনা, তাই দেরী হচ্ছে।

বীণা বললে—তার চেয়ে তনিমাকে দেখিয়ে নিলেই ত পারো! চট্ করে হয়ে যাবে, তাই যাও।

গণপতির বোধ করি রাগ হলো। বললে—মাইরি আর কি! তোর কি ধারণা—তনিমা আমার চেয়ে বেশি বিদ্বান? নেভার মাইণ্ড। হাজার হলেও তনিমা 'শী' আর আমি 'হি'—কতো তফাৎ! যাক্‌গে পাখাটা নিয়ে আয়, বাতাস কর্।

বলেই সে আবার মাথা গুঁজে লিখতে বসল।

এক হাতে গড়গড়ার নল, এক হাতে পেন্সিল।

লেখা যখন শেষ হলো রাত তখন দশটা।

গণপতির চোখ মুখ দেখে মনে হলো, সে যেন যুদ্ধ জয় করেছে। হাসতে-হাসতে বললে—বাস্, ফিনিস্! এইবার দেখাব তনিমাকে। কলকেটা তুমি আর একবার—

বীণা কল্‌কেয় আগুন দিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ফুঁ দিচ্ছিল।

আগুনের আভায় উজ্জ্বল তার সেই সুন্দর মুখখানির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে-তাকিয়ে গণপতি আর থাকতে পারলো না। হাত বাড়িয়ে বীণার কাপড় ধরে তাকে কাছে টেনে এনে বললে—থাক্, ও ধরে যাবে, অম্‌নি বসিয়ে দাও!

বীণা হাসল সলজ্জ ভঙ্গিতে।

তারপর কলকেটি গড়গড়ার উপর বসিয়ে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বললে—কি?

—এসো।

বলেই তাকে কাছে টেনে এনে গণপতি বললে—এ কদিন তোমাকে আমি অনেক বকেছি। না? তোমার ভারি কষ্ট হতো। কেমন?

আনন্দে বীণার মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছিল না। কথার পরিবর্ত্তে তার চোখদুটি অশ্রুভরে টলমল করতে লাগলো। গণপতির পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে চোখ মুছে বীণা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু গণপতি তার আগেই তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে—তোমায় আমি খু—ব ভালবাসি বীণা।

বীণা বললে—আর আমার কিছু চাই না।

বলে সে তার পা দুটি জড়িয়ে ধরে বারে-বারে মাথাটা সেই-খানেই ঠেকাতে লাগলো।

গণপতি বললে—কি লিখলাম শুনবে?

বীণা মুখ তুলে ফিক্ করে একটু হাসলো। বললে—আমি কি বুঝবো?

—তাও ত বটে। কিন্তু আমি ওতে তোমার কথা লিখেছি

বীণা। এই দেখ—আই এণ্ড মাই ডিয়ার রাণী, হ্যাভিং গট্ নো মাণি, গিভিং ইউ দিস্ হানি!

কিন্তু আমার নাম ত বীণা, রাণী নয়।

গণপতি বললে, মানে হৃদয়ের রাণী আর কি!

বীণা বললে—কিন্তু রাণীর ইংরাজীও কি রাণীই হয় নাকি?

গণপতি বললে—নিশ্চয়। রাজা রাণী কি পাল্টায়, এ সব জায়গাতেই এক! বলে গড়গড়ায় একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললে—যাই তনিমাকে অবাক করে দিয়ে আসি।

বীণাও উঠে দাঁড়াল। বললে—চল।

॥ আঠারো ॥

কুমার সেই যে চলে গেছে, তারপর আর দেখা নেই।

তনিমা সারাদিন ঘরে বসে আছে। অলক লোক পাঠিয়েছে, চিঠি লিখে জানিয়েছে যে কাল বিয়ে। বিকেলে তাদের সকলকে আনবার জন্য মোটর পাঠানো হবে। গণপতি আর বীণা যেন আসে।

তনিমা মুখ ভার করে বসেছিল। সারাদিন সে আজ পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে।

কাগজখানা তার হাতের কাছে বাড়িয়ে দিয়ে হাসতে-হাসতে গণপতি বললে—দ্যাখ্!

তনিমা মনে-মনে পড়তে লাগলো।

পড়তে-পড়তে তার মুখখানা একটু-একটু করে হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অবশেষে এক সময় হো-হো করে হেসে উঠে বললে—কি হবে এটা?

গণপতি বললে—কি আবার হবে? কাল ওটা ছেপে বিয়েতে বিলোব।

তনিমা বললে—বেশ। কাল সকালেই আমি এটা ছাপিয়ে

দেবো। চমৎকার হয়েছে। তুমি এমন সুন্দর কবিতা লিখতে পার, তা ত জানতাম না দাদা।

গর্বে আনন্দে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে গণপতি বললে—পড়্ না ভাল করে—পড়েই ছাখ্ না একবার।

—বা, পড়লাম যে! বলে তনিমা আর একবার জোরে-জোরে পড়তে লাগলো—

Marraige of my sister
With a physician mister,
I am happy and my sister is glad,
She will secure a beautiful lad.
We will be double-double,
I shall pull houble-bouble,
Rani will no longer be sad.
I shall laugh and I shall cough
and I will dance.
Tanima has got many friends
They will get no entrance.
They will be sorry, they will come no more,
They will break their heads on the door.

—চমৎকার দাদা।

গণপতি বললে—আরে শেষ পর্যন্ত পড় না—ওই যে এই জায়গাটা, having got no money—

—পড়েছি, বলে কাগজখানা রেখে দিয়ে তনিমা বললে—কাল তোমাদের ও বাড়িতে যেতে হবে কয়েকদিনের জন্যে। যেয়ো যেন। মোটর এলেই তাতে চলে যেয়ো।

—যাব। বলে ঘাড় নেড়ে এই সুযোগে একটা কথা গণপতি তাকে জিজ্ঞাসা করে নিল। বললে—বিয়ের পর তুই থাকবি কোথায়? এখানে না অলকবাবুর বাড়িতে?

তনিমা মাথা নীচু করে বললে—যেখানেই হোক থাকব দাদা, টাকা-কড়ি, খরচ-পত্রের জন্যে ভেবো না। যেখানেই থাকি, আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ো।

গণপতিও সেটাই জানতে চায়।

বিকেলে অলকের মোটর এসে দরজায় দাঁড়ালো। সোফার বললে—আপনাদের নিতে এলাম।

তনিমার সেদিন কি যে খেয়াল হলো কে জানে, বেলা তিনটের সময় থেকে সে তার ইচ্ছামত নিজের ভালো-ভালো গয়না-গাটি কাপড় ইত্যাদি পরিয়ে চুল বেঁধে দিয়ে আল্‌তা পরিয়ে বীণাকে সাজাতে লাগলো। বললে—যাও, তুমি গাড়িতে বোসো, আমাদের হয়ে গেছে।

বীণা বললে—কি যে করিস্‌ ভাই, আজ তোর বিয়ে অথচ নিজে না সেজে আমাকে সাজাতে বসলি! আমার বিয়ে ত নয়!

তনিমা হাসলো। বললে—আমার এতেই রক্ষা নেই, তার ওপর সাজি যদি ত সবাই বিয়ে করতে চাইবে। সেই জন্যেই সাজলাম না।

বীণাও হাসলো। তনিমা তাকে কাপড়টা ভাল করে পরিয়ে দিয়ে আর্শীর কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে গালটা টিপে দিয়ে বললে—ত্যাখ্‌ দেখি একবার তাকিয়ে নিজের দিকে! ইচ্ছে করলে তুই—

কথাটা তাকে শেষ করতে না দিয়ে বীণা বললে—যাঃ!

তনিমাও তা আর শেষ করলো না। হাসতে-হাসতে বললে—এইবার তোর হাতে একটা দইএর খুরি দিলেই মানায় ভালো। কি বল্‌? খুরি অনেকদিন খাসনি, না? চল্‌—বিয়ে বাড়িতে সবাইকে বলে দেবো।

বীণা লজ্জিত হয়ে উঠলো। বললে—খবরদার বলছি তনিমা তাহলে কিন্তু ভাল কাজ হবে না।

—আচ্ছা, এইবার তাহলে আমি নিজে সাজি। বলে তনিমা দুই হাত দিয়ে সর্ব প্রথমে তার মাথার খোঁপাটা টেনে খুলে ফেলতেই ঘন সুগন্ধি কুঞ্চিত চুল তার সমস্ত পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়লো! তারপর আর্শীর সামনে দাঁড়িয়ে গ্রীবা বেঁকিয়ে চিরুণী দিয়ে তা আঁচড়াতে-আঁচড়াতে বললে—বিয়ের কনে নিজের হাতে সাজগোজ করে চললো বিয়ে করতে! শুনেছিস্ কখনও?

বীণা বললে—আয় না, আমি সাজিয়ে দিই।

তনিমা বললে—তোর সাজানো আমার পছন্দ হবে না। তার চেয়ে যা তুই বরং দু দণ্ড দেখিয়ে আয় নিচে, আমি যাচ্ছি।

বীণার ইচ্ছাসত্বেও সে লজ্জায় যেতে পারছিল না। তনিমা জোর করে তাকে ঘর থেকে ঠেলে বের করে দিয়ে দরজায় খিল বন্ধ করে দিল।

সাজসজ্জা করে বের হতে দেরী বিশেষ তার হলো না। দেখা গেল নিতান্ত সাদাসিধে অনাড়ম্বর সাজ! কিন্তু আশ্চর্য্য ওর মধ্যে কোথায় কি যে মাদকতা গোপনে মিশেছে কে জানে, সহজে সেদিক থেকে আর চোখ ফিরাতে ইচ্ছা করে না।

দরজায় তালাচাবি বন্ধ করে তিনজনেই গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

গণপতি তার ইংরেজি প্রীতি-উপহারের কথাটা ভোলেনি। বললে—ছাপাখানা থেকে ত নেওয়া হলো না?

ছাপাতে তনিমা দেয়নি। বললে—ওখান থেকে লোক পাঠিয়ে দিলেই হবে। চল।

বিয়ে আরম্ভ হতে তখনও দেরী আছে।

অলকের সুসজ্জিত শোবার ঘরখানিতে তনিমার হাত ধরে নিজে এসে সেই যে বসিয়ে রেখে গেছে তারপর অলকের আর দেখা নাই।

বীণা ও তনিমা বসে-বসে গল্প করছিল।

গণপতিকে অলক সঙ্গে নিয়ে গেছে।

হঠাৎ এক সময় তনিমা গণপতিকে ডেকে পাঠাল। গণপতি এসেই জিজ্ঞাসা করলে—এসেছে? কই দেখি? কেমন ছাপা হলো?

বীণার কাছ থেকে তনিমা তাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বললে—সর্বনাশ হয়েছে দাদা, যে ছাপাখানায় ছাপতে দিয়েছিলাম শুনলাম নাকি হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম পেয়ে তারা ছাপাখানা বন্ধ করে দেশে চলে গেছে। এখন উপায়?

গণপতির মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়ে গেল। চোখ দুটো বড় বড় করে তনিমাকে সে বকতে লাগলো।—তোর যেমন বুদ্ধি, কেন আমায় দিলি না কেন? কোথায় কোন্ বাজে ছাপাখানায়··· ছি ছি ছি ছি···

তনিমা বললে—যাক যখন হলোই না, আমি একটা উপায় ঠিক করেছি শোন। বলে সে তার আঁচলের তলা থেকে হীরে বসানো সোনার একটা দামী ব্রোচ বের করে তার হাতে দিয়ে বললে—এইটি তুমি আমায় উপহার দিয়ো। তোমার ও কাগজে ছাপানো উপহারের চেয়ে ঢের ভালো।

ভেলভেটের বাক্সটা বার-কতক নাড়াচাড়া করে গণপতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—আচ্ছা তাই হবে।

বলে সযত্নে সেটি সে তার জামার পকেটে রেখে ক্ষুন্ন মনে সেখান থেকে চলে গেল।

তনিমাও কোনরকমে তার হাসি চেপে ঘর থেকে বের হচ্ছিল, এমন সময় অলকের একটা চাকর এসে তার হাতে খামের একখানি চিঠি দিয়ে বললে—বাবু রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। জবাব চাইলেন।

তনিমা খামখানি খুলেই দেখে. তার নামে পাঁচ হাজার টাকার একখানি চেক এবং নামহীন এক টুকরো কাগজের ওপরে লেখা—এরই জন্যে দেখা করতে পারিনি। এখনও সময় আছে।

তনিমা একদৃষ্টে সেই কাগজখানির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার বাবু কোথায় ?

চাকরটা বললে—বাবু ত এই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

তনিমা বললে—ও বাবু নয়, অলকবাবু, ডাক্তারবাবু।

—বাবু ত গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন এক্ষুনি।

—বেরিয়ে গেলেন ? বলে আবার কিছুক্ষণ ভেবে বললে—ডাকো ত এই বাবুকে! নিয়ে এসো আমার কাছে ডেকে!

কুমারকে পৌঁছে দিয়ে চাকরটি চলে গেল।

কুমারের উস্কো-খুস্কো রুক্ষ চেহারা! দেখে মনে হলো, কয়েকদিন যেন স্নানাহার হয়নি। চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ণ মুখ।

তনিমা তার মুখের পানে তাকিয়ে হাসতে গিয়েও হাসতে পারলো না। বললে—একি! এই জন্যেই বুঝি সেই সেদিন থেকে এমনি করে নিজেকে মেরে—

কুমার বললে—তা হোক!

তনিমা তার হাত ধরে পাশের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললে—বোসো।

—তা হোক কি রকম? আমার জন্যে নিজেকে বুঝি এমনি করে কষ্ট দিতে হবে।

কুমার বসলো না। বললে—সে কথা এরপর হলেও চলবে! এখন তুমি কি করবে বল।

তনিমা বললে—কি আমি করতে পারি বল।

কুমার একটুখানি ভেবে তনিমার মুখের পানে একবার তাকিয়ে বললে—আমার একটুখানি দেরী হয়ে গেছে, না ?

—বুঝতে পারছো না ?

—পেরেছি। কিন্তু—কিন্তু—

তনিমা ঈষৎ হেসে কুমারকে এক-রকম জোর করেই চেয়ারের ওপর বসিয়ে তার কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে—এতে অত ভাববার কি আছে বল ত ? হোক্ না বিয়ে!

বলে সে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি কি যেন বলে তার গালের ওপর সজোরে একটা চুম্বন দিয়ে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

সেই কথার জন্যে কি হাসির জন্যে কে জানে, কুমারের মুখের ওপর থেকে সে-দুঃখের পর্দাটা যেন ঠিক যাদুমন্ত্রের মতই নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেল। সেও একটু হেসে তনিমার সুকোমল সুন্দর হাতদুটি নিজের দুই হাতের মুঠোর মধ্যে জোর করে চেপে ধরে বললে—এখানে থাকা আর আমার উচিত নয়। আমি চলি।

বলেই সে চলে যাচ্ছিল।

খামখানা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে বললে—বা, এটা নিয়ে যাও। পাগল হলে নাকি ?

—হতে আর দেরি নেই তনিমা। বলে কুমার ফিরে দাঁড়াল।

খামখানা তার হাতের মধ্যে দিয়ে তনিমা আবার মুখ টিপে একটুখানি হাসল। বললে—এরই মধ্যে ?

কুমার সে-কথার আর জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তনিমা যেন তাকে বিদ্রূপ করে বললে—হ্যাঁ, পালাও।

সিঁড়ির মাথায় কুমার এবার মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখে, তনিমা তাকে দেখিয়েই বোধ হয় মুখে কাপড় চাপা দিয়ে আবার হাসতে সুরু করেছে।

॥ উনিশ ॥

বিয়েবাড়ি থেকে অতিথি-অভ্যাগত সব বিদায় নিয়েছে।

বীণাকে নিয়ে গণপতি নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে।

তনিমা এখন অলকের বিবাহিতা স্ত্রী।

অলকের খুশীর আর যেন সীমা নেই। হাসতে-হাসতে স্ত্রীকে

আদর করে বলে—এতদিন পরে যেন বাঁচলাম তনিমা। গৃহলক্ষ্মীকে পেয়ে—শুধু আমার গৃহ নয়, দেহ-মন সবই যেন স্নিগ্ধ সুন্দর বলে মনে হচ্ছে।

তনিমা শুধু একটুখানি সলজ্জ মৃদু হেসে চুপ করে থাকে।

অলক তার কাছে গিয়ে মুগ্ধ তন্ময় দৃষ্টিতে তনিমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে সযত্নে তার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে—ত্মাখো তনিমা, বিয়ে না হলে মেয়েদের বোধ হয় মানায় না। তোমাকে আগেও আমি দেখেছি, কিন্তু এখন যেন মনে হচ্ছে—তুমি আর সে তনিমা নও।

তনিমা এতক্ষণ পরে কথা বলে। বলে—কেন, আমি কি বদলে গেছি?

অলক বলে—নিশ্চয়।

বলেই সে তার শুভ্র-সুন্দর ললাটের ওপর থেকে বাঁকা, কুঞ্চিত চূর্ণ চুলের গুচ্ছগুলি ধীরে-ধীরে সরিয়ে দিয়ে বলে—মুখে তোমার কেমন যেন একটা উগ্রতা ছিল—এরই মধ্যে তা কোথায় মিলিয়ে গেছে। তোমায় এত ভাল লাগছে তনিমা—

কথাটা শেষ না করেই অলক তার নিজের মুখখানি নত করে তনিমার ঠোঁটে একটু চুম্বন করলে।

লজ্জায় তনিমা তার মুখখানি নীচু করে নীরবে কয়েক মিনিট বসে থেকে মুখ তুলল। ডাক্তারখানায় যাবার জন্যে অলক তখন আর্শীর সামনে দাঁড়িয়ে গলার টাইটা বেঁধে নিচ্ছিল।

তনিমা বললে—দাও দেখি, ওটা তোমার বাঁধতে পারি কি-না।

—ত্মাখো! বলে সানন্দে অলক তার গলাটা বাড়িয়ে দিল।

হাসতে-হাসতে টাই বাঁধবার বৃথা চেষ্টা করে তনিমা।

অলক হেসে বললে—বুঝতে পারছি। দাও, তুমি পারবে না। ত্মাখো আমি কেমন করে বাঁধি।

বলে টাইটা অলক নিজের হাতে নিয়ে তনিমাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে বেঁধে ফেলল।

তনিমা বললে—আচ্ছা, কাল থেকে আমি বেঁধে দেব দেখো।

অলক মোজা পায়ে দিয়ে জুতো পরছিল। তনিমা তাড়াতাড়ি তার পায়ের কাছে বসে পড়ে বললে—এটা ত পারি।

বলে সে একরকম জোর করেই জুতোর ফিতেগুলো তার বেঁধে দিয়ে বললে—এবার কাজে যাও, আমি তোমার ঘরকন্নার কাজ দেখি। ফিরতে কি তোমার খুব বেশি রাত হবে?

অলক বললে—খুব বেশি রাত না হলেও ন'টার কম ত ফিরতে পারবো না লক্ষ্মীটি, কি করব বল মন আমার এই খানেই পড়ে থাকবে।

দরজা পর্যন্ত তার পিছু-পিছু এগিয়ে গিয়ে তনিমা যেন অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললে—একটু সকাল-সকাল ফেরবার ব্যবস্থা করো বাপু, একলা বাড়ি কি করে যে থাকব কে জানে। চব্বিশ ঘণ্টা ছুটে বেড়ানো অভ্যেস।

অলক তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—তাও ত বটে। আচ্ছা তুমি না-হয় এক কাজ করো। গাড়িটা আমি আগেই পাঠিয়ে দেবো, সন্ধ্যেয় একটুখানি বেড়িয়ে এসো। কেমন?

তনিমা বললে—না থাক্, আর গাড়ি পাঠাতে হবে না। একান্তই যদি অসহ্য হয়ে ওঠে ত না-হয় ট্যাক্সি করেই খানিকটা ঘুরে আসব।

অলক আবার তার কাছে এগিয়ে এসে, যাবার আগে আবার তাকে একটু আদর করে বললে—তাই এসো। আয়রণ সেফের চাবি ত দেখেছ কাল কোথায় আছে। টাকাকড়ি যা দরকার হবে—

নিতান্ত সুবোধ মেয়েটির মত ঘাড় নেড়ে তনিমা বললে—বেশ।

ডাক্তারখানা থেকে ফিরে উদ্‌গ্রীব চঞ্চল স্বামী তার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে বলে—কাজে আর আমার মন বসছে না তনিমা, সব সময় মনে হয় যেন তোমার কাছে ছুটে আসি।

তনিমা বললে—আমারও।

অলক জিজ্ঞাসা করলে—গিয়েছিলে বেড়াতে ?

—গিয়েছিলাম একটুখানি। খরচের জন্যে দাদাকে কিছু দিয়ে এলাম।

—বেশ করেছ। দেখো, কৃপণতা কোরো না যেন। গণপতিকে আমার খুব ভাল লাগে।

তনিমা হেসে বলে—এযে সবই উল্‌টো শুনছি গো। কই, আগে ত কোনোদিন ভাল লাগতো না!

অলক বললে—সত্যি এ এক অদ্ভুত পরিবর্তন।

পরমানন্দে অলকের দিন কাটতে লাগলো। মনে হতো পৃথিবীর রং যেন তার কাছে বদ্‌লে গেছে। নিজেরই অন্তরের মধ্যে প্রেমের যে অপ্রকাশিত মাধুরী এতদিন সে সযত্নে লালন করছিল তারই রঙে আজ তার চোখের সাম্‌নে বিশ্বজগৎ যেন রঙিন হয়ে উঠেছে।

অলকের সিগারেট খাওয়া অভ্যাস। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সে সিগারেট টানছে। বাইরে অপর্যাপ্ত জ্যোৎস্নার সঙ্গে শহরের পথে গ্যাসের আলো মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।

গ্রীষ্মকালের রাত। মৃদু মন্দ বাতাস বয়ে চলেছে।

খাটের ওপর শুয়ে তনিমা কি একখানা বাংলা নভেল পড়ছিল। এক সময় মুখ তুলে বললে—ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে!

—এই সিগারেটটা শেষ করে নিই।

—কেন এখানে বসে শেষ করা যায় না ?

—সিগারেটের ধোঁয়া তোমার সহ্য হবে ? দরকার কি ? এই ত হয়ে গেল।

বলে জ্বলন্ত সিগারেটটা সে জানলার বাইরে ফেলে দিয়ে খাটের ওপর তার কাছে এসে বসল।

তনিমা বললে—এ-সব তুমি বাড়াবাড়ি করছ না ত? কেন,

সিগারেটের ধোঁয়া আমার অসহ্য হবে কেন? সিগারেট ত সিগারেট, সেই সুগন্ধি চুরুটগুলোও ত দিব্যি নিশ্চিন্তে কতদিন আমার কাছে বসে-বসে টেনেছ। মনে নেই? গন্ধ সহ্য করতে না পেরে কতদিন উঠে গেছি। তা কই, তখন ত তুমি গ্রাহ্যও করনি?

অলক বললে—তবে আর বলছি কি তনিমা, তখন আমি ত মানুষ ছিলাম না, ছিলাম জানোয়ার। তোমায় ঠিক ভালো তখন আমি বাসতাম না বোধ হয়। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে ঠিক জানোয়ারের মত তোমার পাশে-পাশে ঘুরে বেড়াতাম।

—অথচ হঠাৎ আমার মধ্যে কিই বা এমন দেখলে, যার জন্যে তুমি এমন করে বদলে গেলে বল ত? আমার কিন্তু ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না, সত্যি বলছি, মাঝে-মাঝে মনে হয় যেন তুমি অভিনয় করছ।

কথাটা বোধ হয় অলককে আহত করলো। একটু ভেবে সে বললে—তোমার মধ্যে কি যে দেখলাম জানি না তনিমা, হয়ত কিছুই দেখিনি। কিন্তু বিয়ের পর প্রথম যখন তোমায় আমি দেখলাম, যখন ভাবলাম, তুমি আমার, তুমি একান্তভাবেই আমার, তখন আমার কি মনে হলো জান? মনে হলো ডুবতে ডুবতে যেন তোমাকে জড়িয়ে ধ'রে, তোমাকে আশ্রয় করে তীরে উঠলাম।

তনিমা বললে—হ্যাঁ, মনে আছে, খুব আদর করলে। কিন্তু এও কি সম্ভব? যাকে তুমি বিয়ের আগের দিন পর্য্যন্ত সন্দেহ করেছ, ঘৃণা করেছ, অবিশ্বাস করেছ···সেই তাকেই তুমি হঠাৎ ভালবেসে ফেললে? তোমার সব মিছে কথা। বাপরে বাপ্! পুরুষ মানুষ, এত অভিনয় করতে জানে!

বলে তনিমা তার মুখের পানে তাকিয়ে অবিশ্বাসের হাসি হাসতে লাগল।

অলক বললে—তুমি হাসছো তনিমা, হাসো। কিন্তু সত্যি বলছি—এ হাসির কথা নয়। তুমি বিশ্বাস কর।

তনিমা বললে—বিশ্বাস আমি করেছি। কিন্তু সেই তুমি অন্য কেউ?

অলকের পিঠের ওপরে যেন কেউ চাবুক বসিয়ে দিল। বেদনায় অস্থির হয়ে চুপ করে নীরবে শয্যাপ্রান্তে শুয়ে রইলো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর বালিশের ওপর থেকে বইখানা সরিয়ে দিয়ে তনিমা প্রথমে ধীরে-ধীরে অলকের কাছে এগিয়ে গেল। তারপর মুখের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—চুপ করে রইলে যে? রাগ করলে নাকি?

অলক মিথ্যা কথা বলল। বললে—না ঘুম পাচ্ছে।

তনিমা বললে—এই ত। এমনি তোমরা সব। ঘুম তোমার পায়নি তা আমি জানি, অথচ বলছ ঘুম পাচ্ছে! এসো, কথা কও। সারাদিনের মধ্যে কতটুকুই-বা দেখো। ওগো, তাকাও!

অলক চোখ মেলে চাইল। বললে—কি কথা বলব?

তনিমা হেসে-হেসে তার ওপর ঢলে পড়ল। বললে—এই বুঝি তোমার ভালবাসার কথা হলো?

অলক এবার আর চুপ করে থাকতে পারল না। হাত বাড়িয়ে তাকে তার বুকের ওপর টেনে এনে বললে—ভালবাসার কথা যে তুমি শুনতে চাইলে না রাণী! তুমি যে আমার ভালবাসার—

তনিমা তার বুকের ওপর মাথা রেখে বলে উঠল—অবিশ্বাস আমি করিনি গো করিনি। তবে আমি এও ঠিক জানি যে আমায় ভাল তোমায় একদিন বাসতেই হবে। না ভালবেসে তুমি যাবে কোথায়? আমার ভালবাসা ত অস্বীকার করতে পারবে না। আমার ভালবাসাই তোমায় ফিরিয়েছে।

অলক বললে—হয়ত তাই। কিন্তু দ্যাখো তনিমা, রাণী আমার, তোমায় শুধু আমার একটি অনুরোধ—আমার ভালবাসায় যদি তোমার কোনদিন অবিশ্বাস হয় ত সে-কথা আমায় তুমি মুখ ফুটে বলো না। আমায় শুধু নীরবে তোমায় ভালবাসতে দাও। এ আমার বেশ লাগছে।

তনিমা হাসল। বললে—তথাস্তু।

কিন্তু এই একটিমাত্র অতি তুচ্ছ অবিশ্বাসের কথায় অলকের বুকের ভেতরটায় সেদিন কোথায় কি কল যে বিগড়ে গেল কে জানে, অনেক রাত পর্য্যন্ত দু'জনে হাসিতে গল্পে কথায়-বার্তায় কাটিয়েও অলক তার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা দারুণ অতৃপ্তি বোধ করতে লাগল।

গল্প করতে-করতে তনিমার কথাগুলো হঠাৎ এক সময় জড়িয়ে এলো, চোখের পাতা দুটো ক্রমশঃ ভারি হয়ে বন্ধ হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই দেখতে-দেখতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। অথচ অলকের চোখে সেদিন আর ঘুম এলো না। আলোর বেড্-সুইচটা টিপে সেখান থেকেই নিবিয়ে দিল। ঘর অন্ধকার। কিন্তু আকাশের অজস্র জ্যোৎস্না তখন বিছানার ওপর এসে পড়েছে। ঘরে আলো ছিল বলে এতক্ষণ কেউ তা টের পায়নি। সেই জ্যোৎস্নালোকিত শুভ্র শয্যায় তারই একান্ত সন্নিকটে পূর্ণবিকশিত ঘনসুগন্ধী ফুলের মত নবযৌবনসম্পন্না অপরূপ রূপলাবণ্যবতী যে সৌন্দর্য্য-প্রতিমা তার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করে অকাতরে ঘুমাচ্ছিল, তার সেই অম্লান প্রফুল্ল ঘুমন্ত মুখের পরে অলক তার নিদ্রাহীন দু'টো চোখের ব্যগ্র ব্যথিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ঘননিবিড় আনন্দের পরিবর্তে কেন যে অন্তঃকরণে একটি সুতীব্র বেদনা বোধ করতে লাগলো কে জানে! মনে হলো এমনি করেই বিধাতা হয়ত তাকে তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করাবেন। যাকে সে একদিন তার একান্ত ভোগের সামগ্রী বলেই কামনা করেছিল, যে তাকে চিরদিন অমানুষ পশু বলেই জানে সে তার প্রেমের অর্ঘ্য অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করবে না ত কি!

করুক। তবু সে তাকে ভালবাসবে।

অলক ধীরে-ধীরে তার ঘুমন্ত মুখের ওপর কয়েকটি চুমু খেয়ে চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল।

বিকালে অলক ডাক্তারখানায় চলে যাবার পরেই তনিমাও নিত্য নিয়মিত তার স্নানের ঘরে গিয়ে ঢোকে। সেখান থেকে বের হয়ে প্রসাধন শেষ করে সেও ট্যাক্সিতে চড়ে বেড়াতে বের হয়।

প্রথম-প্রথম সন্ধ্যার আগে সে বাড়ি ফিরত, আজকাল ফিরতে তার দেরী হচ্ছে। স্বামী তার সে সম্বন্ধে কোনদিন কোন কথাই জিজ্ঞাসা করে না। অলক ঠিক তেমনি করেই তার উদ্‌গ্রীব চঞ্চল বাহু প্রসারিত করে বাড়ি ফিরেই তনিমাকে জড়িয়ে ধরেই চুমু খায়। ভাল সে এখনও তাকে তেমনি করেই বাসে।

তনিমার অবিশ্বাসের কথাটা এখনও মাঝে-মাঝে হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়। মনে পড়ামাত্র সে চম্‌কে ওঠে, সে একবার আত্মস্থ হয়ে চিন্তা করে দেখে, ভাবে—এ কিছু নয়। তখন সবেমাত্র তনিমা তার বাড়ি এসেছে, পূর্ব পরিচয়ের স্মৃতি তখনও সে ভুলতে পারেনি। তাই অবিশ্বাস করা তনিমার পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। এতদিনে হয়ত সে তা ভুলে গেছে। হয়ত কেন নিশ্চয়ই। তা না হলে তনিমাই বা তাকে এমন করে তার সুনিপুণ হাতের স্নেহময় সেবায় এবং সযত্ন পরিচর্যায় এতখানি মুগ্ধ বিহ্বলই বা করে দেয় কেমন করে।

অলক এতেই সুখী। তনিমার কাছ থেকে সে আর অধিক কিছু চায় না।

দুরু-দুরু বক্ষে সে নিতান্ত নীরবে শুধু সেই পরম রহস্যময়ী তনিমার স্নিগ্ধ সুন্দর মুখখানির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

তনিমা হয়ত জিজ্ঞাসা করে—একদৃষ্টে অমন করে দেখছ কি বল ত ?

—কিছু না। বলে হেসে সে তনিমার কাছে এগিয়ে গিয়ে একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে ধীরে-ধীরে তুলে নিয়ে চম্পা-কলির মত পেলব সুন্দর রক্তমুখী আঙুলগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে দুজনের মধ্যে কেমন যেন একটা বহুবাঞ্ছিত সান্নিধ্য অনুভব করতে থাকে।

তনিমা বলে—আমায় কি তোমার এখনও বিশ্বাস হয় না ?

অলক বলে—এ-কথা তুমি কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করছো তনিমা ?

—করব না ?

অলক ঘাড় নেড়ে বলে—না।

তনিমা গোপনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে।

॥ কুড়ি ॥

সুখ-দুঃখ মিলন-বিরহের দ্বন্দ্ব-দোলায় দুলতে-দুলতে এই নব-বিবাহিত দম্পতির সুদীর্ঘ একটি বৎসর কেটে গেছে।

পরিবর্তনের মধ্যে তাদের বিশেষ কিছুই পরিবর্তন হয়নি। অলকের চেহারা যেন আরও ভাল হয়েছে। তনিমার চেহারার ভালমন্দ কিছুই বোঝবার জো নেই !

পরিবর্তন হয়েছে বীণার সংসারে। কিছুদিন হলো বীণার একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে হয়েছে। ছেলেটিকে দেখবার জন্যে তনিমা প্রায়ই সেখানে আসা-যাওয়া করে। সদ্যোজাত শিশুর তত্ত্বাবধানের জন্যে কয়েকদিন আগে তনিমাকে দু'তিন রাত্রি সেখানে কাটাতে হয়েছিল। এখন একটা লোক রেখে দেওয়া হয়েছে। তনিমা মাঝে মাঝে যায় বটে, তবে রাত্রে থাকে না।

কিন্তু হঠাৎ সেদিন একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

বিকেলে নিয়মিত তনিমা যেমন রোজ বেরিয়ে যায়, সেদিনও তেমনি বেরিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারখানা থেকে সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে অলক শুনলো তনিমা নেই। চাকর বললে—মা একটা চিঠি লিখে রেখে একটা ট্যাক্সিতে চেপে চলে গেছেন।

চিঠিখানা খুলে অলক দেখল তনিমার চিঠি। লিখেছে—

প্রিয়তম, খোকার অসুখ। আজ আর আমার ও-বাড়ি যাওয়া

হবে না। কিছু মনে করো না লক্ষ্মীটি। আমি না দেখলে ওদের আর কে দেখবে বল। অসুখ তেমন বাড়াবাড়ি কিছু নয়। হলে তোমায় আসতে লিখতাম। তোমায় এখন কোনও প্রয়োজন নেই। তুমি বরং এসো না—সেই ভালো। তুমি এলেই বীণা ভাববে, ছেলের অসুখ খুব বেশী এবং তাহলে তাকে নিয়েই আমাদের বিব্রত হয়ে পড়তে হবে। আজকের রাতটি কোনরকমে চোখ বুজে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দাও। কাল সকালেই আমি তোমার—। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আমায় থাকতে হলো। ক্ষমা করো। ইতি—তনিমা

তনিমার চিঠি!

একসঙ্গে থাকে বলে চিঠি লেখালেখি তাদের একরকম হয় না বললেই হয়। অথচ চিঠি লেখার একটা মাধুর্য্য আছে। সাদা কাগজের ওপর মনের কথাগুলি কালির অক্ষরে লিখে আর একজনের কাছে পাঠানোর আনন্দ অলক পায়নি। আজ এই প্রথম প্রিয়তমার ছোট্ট চিঠি পেয়ে সে সাগ্রহে সেটা বারে-বারে ঘুরিয়ে বুকে চেপে চুমু খেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে উঠল।

একটি রাত্রের মাত্র এতটুকু বিরহ। খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমিয়ে রাতটা কোন্‌দিক দিয়ে যে পার হয়ে যাবে তা সে বুঝতেই পারবে না। পরদিন সকালে উঠে দেখবে তনিমা এসেছে।

কতটুকুই বা সময়! তবু তার কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা মনে হতে লাগল। মোজা খুলতে গিয়ে পা আর উঠল না। চাকর চা নিয়ে এলো। তনিমার পরিবর্তে চাকরের হাতে চা! তবু তাকে খেতে হলো। কোন রকমে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে রাতের মতো ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম ভাঙলো পরদিন ভোর ছটায়।

চাকর এসে জিজ্ঞাসা করলে—চা আনবো?

ঠাকুর বললে—বাজারের খরচ—

অলক বললে—কত করে হয়?

—আজ্ঞে এক টাকা।

কিন্তু টাকাকড়ি তনিমা কোথায় রেখে গেছে অলক তা খুঁজে পেলো না।

হাত খরচের টাকা অ্যায়রণচেষ্টে থাকবে না নিশ্চয়ই। আর তার চাবিই বা কোথায়? অলক একবার এদিক-ওদিক হাতড়ে দেখল, চাবির সন্ধান কোথাও মিলল না। বললে—যা এখন, পরে দিচ্ছি। গাড়িটা বের করতে বল্ দেখি!

চাকর বললে—চা তৈরী···

অলক বললে—থাক্, চা আর করতে হবে না।

তুজনে একসঙ্গে বসে রোজ সকালে চা খায়। অলক ভাবল আজ গণপতির ওখানেই চা খেয়ে আসা যাক্। নিশ্চয়ই বীণা খুব খুশী হবে। তারপর তনিমাকে নিয়েই আসবে।

তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে গাড়িতে উঠে ষ্টার্ট দিয়ে সোজা বিরহিণী প্রিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

গণপতির বাড়ির সামনে গিয়ে দূর থেকে দেখলো দরজায় একখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অলকের আনন্দের আর সীমা রইলো না। ভাবলে, ভারি একটা মজা করা যাক্। ট্যাক্সিখানা বিদায় করে দিয়ে তার জায়গায় নিজে সে ট্যাক্সি ড্রাইভারের মত নিজের গাড়িখানা নিয়ে দরজায় অপেক্ষা করবে। এই ভেবে ধীরে-ধীরে গাড়িখানা রেখে যেমন মাটিতে পা দিয়েছে, দেখে সদর দরজা খুলে বের হলো তনিমা আর তারই হাতে হাত রেখে একেবারে তার বাঁ দিকে কুমার!

ম্লান একটু হেসে কুমারের দিকে তাকিয়ে তনিমা বললে—কি আর করব বল—তাহলে যাই।

জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ কুমারের চোখ পড়ল অলকের দিকে। হাতে-হাতে ধরা পড়লে চোরের মুখের অবস্থা যেমন হয়, তারও ভাব হলো ঠিক তেমনি। বিদায়ের অভিনন্দন দূরে থাক কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বের হলো না।

কিন্তু বলিহারী তনিমা! কুমারের মুখ-চোখের অবস্থা দেখেই পেছনে যে তার কি কাণ্ড হয়ে গেছে সুচতুরা তনিমা যেন তা ঠিক অন্তর্যামীর মতই টের পেলো।

কথার ধারাটাকে তক্ষুনি এমন তৎপরতার সঙ্গে পাল্‌টে নিলো যে তা একটা দেখবার বস্তু।

এতটুকুও বিচলিত হলো না তনিমা। পেছন ফিরে একবার তাকাবারও প্রয়োজন অনুভব করল না। বরং সে তার একটি হাতের পরিবর্তে দুটি হাত দিয়ে কুমারের হাত ধরে অনুরোধের ভঙ্গিতে বললে—ভাগ্যিস আজ সকালে আপনার দেখা পেলাম! তা এই আপনার দুটি পায়ে ধরে বলে যাচ্ছি কুমারবাবু, আজকাল আমি আমার নিজের সংসার নিয়েই চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকি, এখানে আসবার সময় করে উঠতে পারি না। অথচ আমার দাদা-বৌদি নিতান্ত অসহায়—আপনি যেন মাঝে-মাঝে অন্তত একবার করেও এদের খবর নেবেন। আচ্ছা, আমি তাহলে—এক্সকিউজ মি—আমি বাড়ি না গেলে আবার ওঁর চা খাওয়া হবে না।

বলে পেছন ফিরে যেন ট্যাক্সির দিকে এগোতে গিয়েই মুখ তুলে অলককে দেখে বলে উঠল—আরে, বেশ লোক ত তুমি! ঘুম থেকে উঠেই বুঝি···ছি ছি, চা-ও খাওনি ত? বাবা, তোমায় নিয়ে আর পারলাম না। আমার একটু দেরী হয়ে গেছে, আর অম্‌নি ছুটে এসেছ?

বলেই নিজের হাতে অলকের গাড়ির দরজা খুলে বসে তনিমা বললে—নাও, শীগগির চালাও, আবার এরা দেখতে পেলে বলবে—দ্যাখো এলো না। চল।

ট্যাক্সির ড্রাইভার বললে—হামারা—

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই তনিমা বললে—আমার নিজের গাড়ি এসেছে। তুমি যেমন যাও, যেয়ো, তোমার টাকা দিয়ে দেব।

—সালাম! বলে পাঞ্জাবী-ড্রাইভার চলে গেল।

অলক গাড়ি চালিয়ে দিল।

কিছুদূর গিয়ে তনিমা বললে—রাগ করেছ ত? বেশ। এবারে আমার মরণটা হলে বাঁচি।

ব্যথিত কণ্ঠে অলক বললে—রাগ করব না?

—না। করবে কেন? কষ্ট কি তোমার একার হয়েছে? আমার হয়নি? কি করব বল, ছেলেটার অমন অসুখ দেখে ত আর আসতে পারি না?

অলক গম্ভীর মুখে ষ্টিয়ারিং ধরে রইল, কোনও জবাব দিল না।

তনিমা একটু পরে বললে—এত রাগ? বেশ বাপু বেশ, আর আমি এখানে আসব না। ওরা মরুক আর বাঁচুক, আমার আর দেখবার দরকার নেই। হলো ত?

কতটুকুই-বা পথ। কথা কইবার সুযোগ আর হলো না। বাড়ি এসে গেল। দুজনে গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে ঢুকল। বাড়ি ঢুকেই তনিমা চাকরকে জিজ্ঞাসা করলে—বাবু চা খেয়ে বেরিয়েছিল?

—না মা-জী!

—কেন? কেন চা তৈরি করে এনে দিলিনে হতভাগা?

—বাবু যে বারণ করলেন মা-জী!

—বারণ তুই শুনলি কেন হতভাগা?

অলক বললে—ওকে বকছ কেন? আমিই বারণ করেছিলাম।

—কেন বারণ করলে। জান না, সকালে উঠে চা না খেলে তোমার মেজাজ খারাপ হয়ে থাকে?

—হাত-মুখ ধুয়েছ ত? না তাও না?

—তা ধুয়েছি।

তনিমা চা আনতে বলে অলকের পাশে বসল। তার রুক্ষ চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—রাত্রে ঘুমিয়েছিলে ত?

—হ্যাঁ, রাত দুটোর পর।

তনিমা যেন আতংকে চমকে উঠে বললে—দ্যাখো ত। ছি! হ্যাঁগা, আমার কি একদণ্ড কোথাও যাবার জো নেই?

অলক তার মাথাটা কাৎ করে তনিমার গায়ের ওপর দেহভার

এলিয়ে নিতান্ত বালকের মত আব্দারের ভঙ্গিতে বললে—না, না তনিমা, আমায় ছেড়ে—বল তুমি—জীবনে আর কোথাও—

কোথায় তার ব্যথা, তনিমা তা জানে। মাথাটা তার সযত্নে দুহাত দিয়ে চেপে ধরে আদর করে চুম্বন করে বললে—না, আর যাব না। হলো ত? রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। সকাল-সকাল স্নান করে খেয়ে নিয়ে আজ আর দুপুরে কোথাও বেরিয়ো না লক্ষ্মীটি। ঘুমোও। একেবারে সেই বিকেলে বেরোবে, কেমন?

চাকর চায়ের ট্রে নামিয়ে দিল। তনিমা বললে—ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে। আমিও ঘুমোব।

—কেন, রাত্রে তোমার ভাল ঘুম হয়নি?

—কেন হবে না? আমার আর কি, যত কষ্ট তোমার।

এমনি করে নানা কথাবার্তায় চা খাওয়া শেষ হলো।

॥ একুশ ॥

অলক সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর কোথাও বের হলো না। দুপুরে সে অন্যদিন একটুখানি বিশ্রাম করেই বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। সেদিন সে তনিমার আদেশ মত খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় এসে বসল। কলকাতা শহরে তখন একটু শীত পড়েছে। আলমারি খুলে অলকের জন্যে ভাল দামী একখানি শাল বের করে দিয়ে তনিমা বললে—বোসো, আমি খেয়ে আসি।

বলেই আবার কি মনে হলো দরজার কাছ থেকে হাসতে-হাসতে ফিরে এসে বললে—দেখলে, আমি কিরকম স্বার্থপর। বললাম বোসো। না লক্ষ্মীটি, শুয়ে পড়। ঘুম যদি পায় ত ঘুমিয়ো। জোর করে আমার জন্যে জেগে থাকবার কোনও দরকার নেই।

এই বলে শালখানির ভাঁজ খুলে অলকের গায়ের ওপর জড়িয়ে দিতে গিয়ে নিজেও সে তাকে একবার সস্নেহে জড়িয়ে ধরে আদর

করে মাথাটি তার কোলের ওপর নিয়ে চোখ বুজে কি যেন ভাবল। তারপর মাথা হেঁট করে অলকের তৃষিত ওষ্ঠে নিজের সেই আরক্তিম সরস বিম্বাধর স্পর্শ করে সুগভীর আবেগপূর্ণ একটি চুম্বনরেখা অঙ্কিত করে দিয়ে খাট থেকে নেমে গেল।

ফিরে এসে দেখল, স্বামী তার তখনও ঘুমোয়নি, শালখানি গায়ে দিয়ে ঠিক যেমনটি দেখে গিয়েছিল, তখনও ঠিক তেমনি করেই বসে আছে।

তনিমা জিজ্ঞাসা করলে—ঘুমোও নি?

অলক বললে—না, ঘুম আসছে না।

বাইরের দরজাটি তনিমা বন্ধ করে দিয়ে এসে নিজেও তার পাশে গিয়ে বসল এবং পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে এই দম্পতি নাতিশীতোষ্ণ সেই মধ্যাহ্ন-দিনের শান্তিপূর্ণ একটি নিভৃত বিশ্রামের সুখ উপভোগ করতে লাগল।

সকাল থেকেই অলকের মনে যে দুশ্চিন্তার ছায়া ঘন হয়ে উঠছিল, বিকেলে ঘুম থেকে উঠে তনিমা দেখল তা অপসারিত হয়ে গেছে। অলক আবার ঠিক আগের মত হাসছে, কথা বলছে, ভালবাসছে।

সাহেবী-পোষাক পরে চা খেয়ে অলক ডাক্তারখানায় বের হয়ে গেল। যাবার সময় তনিমাকে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি যাবে না?

তনিমা ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কি যে ভাবল কে জানে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—না। আজ থেকে আমি নিজেকে এইখানে বন্দী করলাম।

অলক বললে—না, তোমার কষ্ট হবে। যদি কষ্ট হয়ত তুমি যাও রাণী। আমি কিছু বলব না।

তনিমা ঘাড় নেড়ে শুধু অলকের কাছে নয়, নিজেরও হৃদয়ের একটা দুর্দমনীয় বাসনার কাছে প্রাণপণে নিজের অনিচ্ছা জ্ঞাপন করে বললে—না—না—না।

অলক বের হয়ে যাবার পর অন্যদিন তনিমা তার সাজসজ্জা ও প্রসাধন নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আজ আর সে-সব কিছু না করে ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ারের ওপর চুপ করে বসে-বসে আকাশ-পাতাল কি যে ভাবতে লাগল সেই-ই জানে।

হেমন্তের শেষে শীত ঋতুর প্রারম্ভে দিন আজকাল একটু-একটু করে ছোট হয়ে এসেছে। পশ্চিমের পরন্ত রোদ জানলার শার্শীতে একটুখানি লাল আভা বিস্তার করে কখন সরে গেছে; অন্ধকার তখনও ঠিক নেমে আসেনি, অথচ দিনান্তের সূর্য্য অস্ত গেছে।

ঠিক এমনি সময়ে চাকরটা ঘরে ঢুকে ডাকল—মা!

টেবিলের ওপর দুহাতে মাথা গুঁজে তনিমা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ধীরে-ধীরে মাথা তুলে বললে—কি?

ট্যাক্সিওয়ালা অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে।

তনিমা বললে—যেতে বলে দে বাবা। কাল এসে সে যেন তার টাকাকড়ি সব চুকিয়ে নিয়ে যায়।

তনিমা উঠে দাঁড়াল। সেই অর্দ্ধালোকিত ঘরের মধ্যে আলো না জ্বেলে জানলার গরাদ ধরে সে একবার বাইরের দিকে শূন্য উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ভাবল হয়ত সে ভাল করল না। হয়ত কুমার তার জন্য অপেক্ষা করে-করে শেষে চলে যাবে। কিম্বা তার স্বামীও ত সন্দেহ করে আজ একবার ও-বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিতে পারে—গত রাত্রে কুমার সেখানে ছিল কি-না। দাদাও যেমন বীণাও তেমনি—বারণ না করে দিলে গোপন তারা কিছুতেই করতে পারবে না। কথাটা ভাবতেই তনিমার আপাদ-মস্তক আতঙ্কে শিউরে উঠল।

কিন্তু তবু তার সেখান থেকে এক পাও নড়বার প্রবৃত্তি হল না।

অন্যদিন যে সময় অলকের বাড়ি ফিরবার কথা, সেদিন যেন তার চেয়েও দেরী করে সে বাড়ি ফিরল। তনিমা অনেকক্ষণ থেকেই বারে-বারে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। সদর দরজায় মোটর

থামবার শব্দ হতেই সে তার হাতের বইখানা বন্ধ করে খাট থেকে নেমে উদ্‌গ্রীব হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

অলক ঘরে ঢুকতেই তনিমা তার মুখের দিকে তাকিয়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। মাথার চুল উস্কো-খুস্কো, গলার টাইটা বেঁকে অন্য জায়গায় গিয়ে পড়েছে, জামাটাও ঠিক তেমনি—এক ঘরের বোতাম অন্য ঘরে লাগানো হয়েছে, চোখ দুটো লাল। কারও সঙ্গে যেন মারামারি হাতাহাতি করে যুদ্ধে পরাস্ত সৈনিকের মত অপমানে ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ মুখ।

সবিস্ময়ে তনিমা তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—একি!

অলক একদৃষ্টে তনিমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। চোখে তার হিংস্র ক্রুর দৃষ্টি। বহু আগের সেই উন্মত্ত অলক যেন আবার ফিরে এসেছে।

—হ্যাঁ, এই। বলে অলক তার কম্পিত হাত বাড়িয়ে তনিমার কাঁধের কাপড়টা দৃঢ় মুষ্টিতে জোর করে চেপে ধরল! তারপর কাঁপতে-কাঁপতে বিস্ফারিত চোখ দুটিকে তনিমার মুখের কাছে এগিয়ে এনে ঠিক যেন সন্ধানী আলো ফেলে তার মুখের ওপর কি যেন অনুসন্ধান করতে লাগল।

মুখে মদের দুর্গন্ধ। অলক মদ খেয়েছে!

তনিমা বিরক্ত হয়ে একখানা হাত দিয়ে তাকে একটু দূরে সরিয়ে দিয়ে বললে—তুমি মদ খেয়ে এসেছ? এতদিন পরে—আবার? ছি।

দৃঢ়কণ্ঠে অলক বললে—হ্যাঁ খেয়েছি। তুমিই খাইয়েছ তনিমা, শোন। বলে নির্দয় নিষ্ঠুরের মত জোর করে তার কাপড় ধরে টানতে-টানতে তাকে একটা চেয়ারের ওপর বসিয়ে নিজেও তার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পরে দুই হাত দিয়ে তার দুই হাত ধরে খুব জোরে ঝাঁকানি দিয়ে ক্ষুব্ধ ব্যথিতকণ্ঠে উন্মাদের মত চীৎকার করে উঠল, তনিমা। তুমি! তুমি! উঃ! বলে দুর্দ্দমনীয় কিসের যেন একটা শ্বাসরোধকারী বেদনায় বিচলিত হয়ে ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলে হাঁপাতে লাগল।

এতক্ষণে তনিমা বুঝল সে যা ভয় করেছিল তাই ঘটেছে। নীরবে মাথা নীচু করে সে চুপ করে বসে রইলো।

কিছুক্ষণ পরে অলক যেন আবার ক্ষেপে উঠল। —তনিমা! তনিমা!

কিন্তু এবার তার আর্দ্রসিক্ত কণ্ঠস্বর যেন অসহ্য বেদনায় ভেঙে পড়তে চায়।

তনিমা মুখ তুলে চাইল। দেখল দুচোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে এসেছে, ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছে, মুখ দিয়ে আর কথা বের হচ্ছে না। এবার ধীরে-ধীরে অলক তার চেয়ারটাকে টেনে তনিমার একান্ত সন্নিকটে এগিয়ে এলো। যে হাত দিয়ে এই কিছুক্ষণ আগে সে তনিমাকে ঝাঁকানি দিয়েছে সেই হাত দুটো বাড়িয়ে তনিমাকে আবার সে সস্নেহে আলিঙ্গন করে তার সেই কাঁদ-কাঁদ মুখখানি তনিমার বুকের ভেতর লুকিয়ে ফুলে-ফুলে কাঁদতে আরম্ভ করল। তনিমার বোধহয় একটুখানি দয়া হলো। তাই সেও তার মাথাটি একহাত দিয়ে ধরে আর-একহাত দিয়ে তার চুলের ফাঁকে ধীরে-ধীরে হাত বুলোতে-বুলোতে বললে—ছিঃ কাঁদে না। ওকি! চুপ কর!

অলক বললে—কাঁদব না? তুমি আমায় এমনি করে কাঁদাবে আর আমি কাঁদতেও পাব না? বুক যে আমার ভেঙে গেল তনিমা।

তনিমা বললে—আমি কাঁদাচ্ছি? কই আমি ত কাঁদাইনি। এ তোমার হেঁয়ালি যে আমি—

অলক ভাবছিল এমন হাতে-হাতে ধরা পড়ে গিয়েও তার এই দুঃখ দেখে তনিমা অন্তত তার অপরাধ স্বীকার করে তার কাছে ক্ষমা চাইবে। মনে-মনে রীতিমত অনুতাপ করবে। কিন্তু তার পরিবর্তে তার এই সাধু সাজবার ভান দেখে অলক আবার রেগে উঠল। মুখ তুলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে জোর করে বললে—কি বললে? হেঁয়ালি? বুঝতে পারছ না? তা পারবে কেন?

তনিমা বললে—কি এমন অপরাধ করেছি যে বুঝতে পারব শুনি? অপরাধ আমি করিনি।

—করনি?

—না করিনি।

—তবে রে শয়তানি! বলে অলক ঠিক উন্মাদের মত তনিমাকে দুই হাত দিয়ে সজোরে ঠেলে ফেলে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তার সেই ধাক্কা সামলাতে না পেরে চেয়ার শুদ্ধু তনিমা যে শক্ত সিমেন্টের মেঝের ওপর একেবারে অতর্কিতে এমন সশব্দে উল্টে পড়বে তা সে ভাবেনি।

উঃ! বলে তনিমা চেয়ার থেকে ছিটকে দূরে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল এবং পড়েও সে চীৎকার করে কাঁদল না, মুখে একটি কথা বলল না, এমন কি অলক যে কি করছে তাও সে একবার মুখ তুলে না দেখে যেমন পড়েছিল তেমনি আধশোয়া অবস্থায় মুখ নিচু করে নীরবে পড়ে রইলো।

রাগে অধৈর্য্য হয়ে অলক তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আবার তার কাছে এসে থর থর করে কাঁপতে-কাঁপতে বলতে লাগল, যার হাত থেকে বাঁচবার জন্য তোমায় আমি বিয়ে করলাম বিয়ের পরেও আবার সেই তারই কাছে রোজ তোমার না গেলে চলে না? তাই ত বলি—রোজ বিকেলে ও যায় কোথায়! উঃ ভালবাসার এই বুঝি প্রতিদান তনিমা? এক সঙ্গে ও-বাড়িতে কাল রাত্রিবাস করা হয়েছে। মরো তুমি ওইখানে পড়ে-পড়ে। তোমার মত মেয়ের বেঁচে থাকার কোনও দাম নেই।

বলতে-বলতে সে থরথর অস্থির ভাবে টলতে-টলতে বার-কতক পায়চারী করে হঠাৎ এক সময় বোধহয় আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে একটা চেয়ারের ওপর ধপ করে বসে পড়ল।

দাঁতে দাঁত চেপে বললে—ভালবাসা! ভালবাসি বলতে তোমার লজ্জা করে না? আমারই বুকের ওপর মাথা রেখে শুয়ে তুমি

অন্যের কথা ভাববে আর আমি তোমায় অন্ধের মত আদর করব ভালবাসব—এ বেশ লাগে। না ?

তনিমার দিকে হঠাৎ চোখ তুলে তাকাতে গিয়ে দেখল তার কপালে কাঁচা রক্তের দাগ। কি মনে করে অলক তার কাছে গিয়ে হেঁট হয়ে বললে—কই দেখি।

দেখলে, চোট লেগে কপালের কাছে খানিকটা জায়গা কেটে গেছে। তারই রক্ত খানিকটা কাপড়ে লেগেছে, খানিকটা টস্ টস্ করে মেঝেতে পড়েছে।

হাত দিয়ে মুখখানি তুলে ধরে কপালের রক্তটা মুছে ফেলতে গিয়ে দেখল তনিমা কাঁদছে। তার অশ্রু-ঝরা মুখখানি মুহূর্তে অলককে সব কথা ভুলিয়ে দিল। ভুলে গেল—সে ব্যাভিচারিণী, ভুলে গেল সে তাকে প্রতারণা করেছে, ভুলে গেল তনিমা তাকে ভালবাসে না। তখুনি উঠে গিয়ে টিন্‌চার আইডিনের শিশি এনে ক্ষতস্থান বেঁধে দিল। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে বললে—চল, শোবে চল। এখানে এমন করে বসে থাকে না।

তনিমা উঠল না। অগত্যা অলক সিগারেট ধরিয়ে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো।

গভীর রাতে যখন তার ঘুম ভাঙল, দেখল তনিমা তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। সে তার টাই, কলার, মোজা খুলে নিয়েছে। অলককে তাকাতে দেখে তনিমা বললে—ওঠ, খাবে চল।

অলক বললে—খেতে আমি পারবো না। তুমি খাও।

তনিমা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ তার হাত ধরে বললে—চল।

অলক বললে—না, আমার ঘুম পাচ্ছে।

—ঘুম পাচ্ছে ত খাটে শোবে চল।

—না, এই বেশ আছি। ছাড়ো।

সত্যিই অলকের ঘুম পাচ্ছিল। দেখতে-দেখতে আবার সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠে স্বামী-স্ত্রীতে কোনও কথা হলো না। নীরবে দুজনে চা খেলো। অলকের মন যেন খুব ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে আজ। তনিমা যে তারই বিবাহিতা স্ত্রী! শুধু বিবাহিতাই নয়, সে তাকে ভালবাসে!

চা খেয়ে অস্নাত অভুক্ত অসহায় অলক বেরিয়ে গেল। বের হবার সময় বলে গেল—ফিরতে দেরী হলে তুমি খেয়ে নিয়ো তনিমা।

বিকেলে চাকর এসে তনিমাকে সংবাদ দিল—মা, সেই মোটর ড্রাইভারটা গাড়ি নিয়ে আজও এসেছে।

তনিমা হেঁট মুখে কি যেন ভেবে মুখ তুলে বললে—ওকে দাঁড়াতে বল্।

তারপর ভাল শাড়ি ও জামা নিয়ে স্নানঘরে যেতে যেতে আবার কি ভেবে সেগুলো রেখে একটা চিঠি লিখলে। লিখে চাকরটাকে দিয়ে বললে—ড্রাইভারের হাতে চিঠি আর এই দশটাকার নোট দিয়ে বল, ওর যা পাওনা তা এই থেকে কেটে নিক। এই চিঠিখানা বাবুকে দিয়ে দেবে।

সেগুলো নিয়ে ড্রাইভার খালি গাড়িতে চড়েই ফিরে গেল।

॥ বাইশ ॥

অলকের যে অমন কন্দর্পের মত চেহারা—দিনে দিনে তাও যেন ম্লান ও শীর্ণ হয়ে উঠতে লাগল।

না খেলে চলে না বলে সে মাত্র একবার খেতে বসে, কোন কিছুতেই তার যেন আর স্পৃহা নেই। তনিমার সঙ্গে কথা যেটুকু না বললেই নয় সেইটুকুই বলে। বাকি অধিকাংশ সময় সে চুপ করে বসে বসে ইংরেজি নভেল পড়ে। সময় সময় সেগুলোও তার কাছে যখন বিরক্তি কর হয়ে ওঠে তখন সে তার হাতের

বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিতান্ত অসময়েই বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়।

কোথাও গিয়ে তার শান্তি নেই।

সে প্রচণ্ড বেদনার দাহ তার অন্তরের মধ্যে দিনরাত জ্বলছে তাকে নেভাবার মত কোন বস্তুই অলক খুঁজে পায় না। অথচ সে বেদনার ইতিহাস কাউকে বলবার নয়।

এক একসময় মনে হয় তনিমাকে এখানে এখানে একা ফেলে রেখে সে বহুদূর বিদেশে পালিয়ে যায়। কিন্তু আবার ভাবে যে তনিমা তার নিত্য ধ্যানের বস্তু, তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেও তার স্মৃতি সে মন থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারবে না। তাকেই একটিবার দেখার জন্য আবার যদি তাকে বিদেশ থেকে ছুটে সে নিষ্ঠুর পাষাণীর কাছে এসে দাঁড়াতে হয় ত তার চেয়ে লজ্জার কিছু নেই।

তনিমা কত রকম করে হেসে ভালবেসে তার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করে। কথা যে বলে না তাও নয় কিন্তু কথা বলে আবার পরক্ষণেই অলকের মনে হয়—ছলনা করে হেসে কথা বলতে গিয়ে তনিমা কি কষ্টই না পেয়েছে। কথা বলবার ইচ্ছা হয়ত তনিমার মোটেই ছিল না, চোখের সামনে একটা জীবন্ত পুরুষের মর্মান্তিক দুঃখে নারীর বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক এবং সে তার স্বভাব ধর্ম্ম রক্ষা করেছে মাত্র। নিজের কৃতকর্ম্মের অনুতাপের কোনও লক্ষণ তাতে নেই। অলক তার আগের দিনের কথা স্মরণ করে। তনিমাকে ভালবেসে সস্নেহ আলিঙ্গনে বুকে জড়িয়ে ধরে হৃদয়ে একদিন সে অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করেছে। সেই পরিপূর্ণ তৃপ্তি সেই অবিমিশ্র আনন্দ লাভ করবার জন্য তৃষিত ব্যকুল আত্মা তার সেই গত দিনের তনিমাকে খুঁজে বেড়ায়। তখনকার দিনের তার সেই প্রত্যেকটি অতি তুচ্ছ ব্যবহারের কথাও স্মরণ করতে গিয়ে অলক অন্তরে-অন্তরে শিউরে উঠে।

জ্যোৎস্নারাতে তনিমা যখন সুকোমল বিছানায় দেহ এলিয়ে

দিয়ে নিশ্চেষ্ট ভাবে ঘুম যায়, অলক তখন ধীরে-ধীরে উঠে বসে। বিরহব্যথাতুর ছুটি সজল চোখ বারে-বারে মার্জ্জনা করে সে তার সেই স্থন্দর মুখখানির দিকে অনিমেষ দৃষ্টি প্রসারিত করে বহুক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে। দেখে-দেখে তৃপ্তি যেন আর হয় না। শুভ্র স্থন্দর ললাটের পার্শ্বে ছু একটি কুঞ্চিত কালো চুল হয় ত এসে পড়েছে। খুব সাবধানে সতর্ক তস্করের মত নিশ্বাস বন্ধ করে আঙ্গুল দিয়ে তা সরিয়ে দেয়। কপালের ওপর তার ক্ষতচিহ্নটি তখনও আছে কিনা দৃষ্টি দিয়ে বারে-বারে হয়ত তাই পরীক্ষা করে, তারপর হঠাৎ একসময় ক্ষুব্ধ ক্ষুধিত অন্তর তার অব্যক্ত ক্রন্দনের বেগে হায়-হায় করে ওঠে। লোভাতুর তৃষিত ওষ্ঠপ্রান্ত তার মুখের কাছ থেকে ফিরিয়ে এনে সে বালিশে মুখ গুঁজে অশান্ত বেদনায় ছটফট করতে থাকে। উদ্বেলিত অশ্রুর উৎস প্রাণপণে দমন করতে গিয়ে তার মেরুদণ্ড থেকে পা পর্যন্ত থর থর করে কাঁপতে-কাঁপতে আবার কতক্ষণ পরে যে থেমে যায় তা সে নিজেই বুঝতে পারে না।

এক-একদিন এমন হয় যে অলক হয়ত তার চোখের সামনে একখানি বই খুলে ধরে পড়বার বৃথা চেষ্টা করছে। মনে তার তনিমার মুখচ্ছবি! ভাবছে তনিমা আজকাল আর বাড়ি থেকে এক পাও বের হয় না, সাজ-সজ্জা সে একেবারেই পরিত্যাগ করেছে, এবার হয়ত সে ফিরবে। গোপনতার গ্লানিতে এতদিন পরে অন্তর হয় ত তার ভরে গেছে। হয় ত সে অন্যায়কে অন্যায় বলে মনে-মনে চিনতে শিখেছে।

কথাটা ভাবতেও অলকের মন যেন আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে। আবেগকম্পিত কণ্ঠে হঠাৎ হয় ত ডেকে বসে—তনিমা ?

তনিমা হাসতে-হাসতে ধীরে-ধীরে তার কাছে এসে দাঁড়ায়।

বলে, কি ভাগ্যিস আজ ডেকেছ। কার মুখ দেখে উঠেছি আজ কে জানে।

বই থেকে মুখ তুলে অলক একবার তার দিকে তাকায়। তনিমার সেই অত্যুগ্র জ্বালাময়ী বহ্নিশিখার মত রূপ আবার যেন তার মনের

মধ্যে তুমুল একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করে দেয়। আদর করে ভালবাসতে গিয়ে মন তার সঙ্কুচিত হয়ে ফিরে আসে। বলে, স্যুটটা আমার চাকর কি কাচতে দিয়েছে তুমি জান?

মুখ ফিরিয়ে তনিমা বলে, জানি না। মনে-মনে বলে—এই জন্যে ডাকলে?

কিন্তু মানুষের মন—দেবতার ধর্মপালন সব সময় তার পক্ষে সম্ভব নয়।

অলক সেদিন বিকেলে ডাক্তারখানায় বের হবার পথে দেখল দামী কাকাতুয়াটার খাঁচার সাম্‌নে চাকরটা গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

অলক বললে— এ কিরে? মরে গেছে পাখিটা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। যাবে না? কুমারবাবুর আদরের চোটে—

—কুমারবাবু? সে আবার কে?

—আপনারই ত বন্ধু। সেই যে রোজ সন্ধ্যাবেলায় আসে।

অলকের চোখের সামনে হঠাৎ বজ্রপাত হয়ে গেল।

বললে—কে? কুমার? রোজ আসে?

এতক্ষণে চাকরটার মনে পড়ল কথাটা বলতে মা-জী তাকে বারণ করে দিয়েছে। অথচ একবার যখন বলে ফেলেছে এখন আর গোপন করেই বা কেমন করে! আম্‌তা-আম্‌তা করে এদিক-ওদিক চেয়ে সে ইতস্তত করতে লাগল। মুখখানি শুকিয়ে তখন তার এতটুকু হয়ে গেছে। মা যদি টের পায়?

অলক তার হাত ধরে দাঁড় ও পাখী সমেত চাকরটাকে নীচের একটা ছোট্ট ঘরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কখন আসে রে?

চাকরটা নিরুত্তর।

—বল্‌ হারামজাদা, নইলে তোকে আমি খুন করে ফেলব।

চাকরটার চোখে তখন জল এসে পড়েছে। নিতান্ত কাতর কণ্ঠে বললে—মা-জী—

—আচ্ছা, মা-জী তোর জানতে পারবে না। তুই বল্‌।

ভয়ে-ভয়ে চাকরটা বললে—রোজ আসে—আপনি বেরিয়ে যাবার অনেকক্ষণ পরে—সন্ধ্যে হলে—তারপর তখুনি আবার চলে যায়।

—আচ্ছা, আমায় যে এ কথা বলেছিস্ সে-কথা তোর মা-জীকে বলিসনে যেন?

উল্টে চাকরটাই সে-কথা তাকে বলতে যাচ্ছিলো। যাক্ এতক্ষণে চাকরটার ধড়ে প্রাণ এলো। মা-জী তাহলে জানতে পারবে না।

অলক কাঁপতে-কাঁপতে মোটরে গিয়ে উঠলো। সোফারকে বললে —তুই চালা। আজ আমি চালাতে পারব না।

॥ তেইশ ॥

সেদিন সন্ধ্যার একটু পরেই মোটরটা ডাক্তারখানার সামনে রেখে দিয়ে ট্রামে চড়ে পরিপূর্ণ মত্ত অবস্থায় অলক তার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো।

কেমন করে যে উপরে উঠে যাবে তাই ভাবছে, এমন সময় সন্ধ্যার আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে ঠিক চোরের মত একটা লোক তার বাড়ি থেকে বের হয়ে তার সুমুখ দিয়েই পথে নামলো।

—ওই কুমার না?

অলক তাড়াতাড়ি ঘুরে গিয়ে তার হাতখানা চেপে ধরে জড়িত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল—কুমার!

আর কিছু সে বলতে পারলো না। রাগে দুঃখে অভিমানে তার সর্ব শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে। অপরাধীর ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়েও চোখদুটি তার অশ্রুভারে কানায়-কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কুমার কিন্তু তাকে আর কোন অবসরই দিল না। একে অনাহারে অনিদ্রায় ক্ষীণশক্তি দুর্বল শরীর—তার ওপর বেদনাবিদ্ধ জর্জরিত হৃদয় অলককে সে অনায়াসে পথের পাশে ঠেলে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিস্ফল আক্রোশে সেদিকে তাকিয়ে অলক উঠে দাঁড়াল।

কোন রকমে বাড়িতে ঢুকে দেরাজ খুলে রিভলভারটা বের করে তার সাতটি নলের মুখে সাতটি গুলি ভরে চেয়ারের উপর বসল।

এমন সময় ঘরে ঢুকল তনিমা। ঈষৎ হেসে বললে—এত সকাল সকাল?

অলক চীৎকার করে উঠল—চুপ! ওইখানে দাঁড়াও। আর এগিয়ো না।

বলে সে পিস্তলটা উঁচিয়ে বললে—দেখছ এটা কি?

তনিমার আপাদমস্তক শিউরে উঠল। কিন্তু সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না। খিল্ খিল্ করে হাসতে-হাসতে ছুটে এসে রিভলভারটা অলকের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বললে—খুন করবে? বেশ ত! দাঁড়াও না, অত তাড়াতাড়ি কেন?

বলেই সে রিভলভারটা টেবিলের উপর বেশ একটু দূরে সরিয়ে রেখে আবার তেমনি করে হাসল। সে এক অদ্ভুত হাসি। সে রকম হাসি অলক তার মুখে কখনো দেখেনি।

—ওকি, তুমি পাগল হলে নাকি?

—না, পাগল আমি এখনও হইনি। কুমারকে ধরে ছিলাম, সে পালিয়ে গেল। আচ্ছা যাক, আজ আমি যেখানে পাব তাকে খুন করে এসে তারপর—

—তারপর আমাকে? তা ভাল, তবে ও-অবস্থায় রাস্তায় গেলে তোমায় যে পুলিশে ধরবে।

—ধরুক! বলে অলক উঠে দাঁড়ালো।

কিন্তু তনিমাকে সরিয়ে দিয়ে যাওয়া সহজ কথা নয়। তনিমা বললে—না, তুমি একটু সুস্থ না-হওয়া পর্যন্ত তোমাকে যেতে দেব না।

—ছাড়ো, যেতে দাও। তোমার দরদের মূল্য আমি বুঝি!

—যা বোঝো তাই বোঝো, এখন এসো আমার সঙ্গে।

ধীরে-ধীরে অলককে মেজের ওপর শুইয়ে দিল তনিমা। তার চুলে হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল।

তনিমাও কিছুক্ষণ পরে তারই পাশে দেহভার লুণ্ঠিত করে শুয়ে পড়লো।

অনেক রাত হলো। ঘড়িতে দুটো বেজে গেল—তবু তনিমার ঘুম এলো না। ওদিকে অলক নির্বিবাদে ঘুমিয়েই আছে।

অবশেষে ঘুম যখন তার কিছুতেই আসে না, তখন সে অলককে জড়িয়ে ধরলো।

অলকের নেশা একটু কেটেছিল, সে তনিমার হাত ধরে বললে—কে তনিমা ?

তনিমা বললে—তা নয় ত কি অন্য কেউ ভেবেছ ?

—হুঁ।

—কিছু বলবে ?

—আমি আর বেশিদিন বাঁচব না তনিমা।

—কেন, কেন বাঁচবে না ?

—তুমিও জিজ্ঞাসা করছ কেন ? এমন করে বাঁচা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব তনিমা ?

তনিমা বললে—আমি ত কিছু করিনি, কেন তুমি আমায় এমন করে খোঁচা দাও বল ত।

—দোষ করনি ? আমি তবু তোমায় দোষ দিই ? তাতে আমি খুব সুখ পাই, না ?

—না, তা হবে কেন ? এক-একটা পুরুষ আছে মিছিমিছি স্ত্রীকে সন্দেহ করা যাদের রোগ। তা ছাড়া আমাকে পাবার আগে যে জীবন তুমি যাপন করেছ তাতে মেয়েদের বিশ্বাস তুমি করতে চাও না। এ তোমার কৃতকর্মের পুরস্কার !

—না, এ বিধাতার অভিশাপ। এক-একবার ভাবি—যে আমায় ধরা কিছুতেই দিল না, তাকে ধরতে যাওয়ার মত ভুল আর কিছু নেই।

—ধরা আমি তোমায় দিইনি ভেবেছ ?

—না তনিমা, তা দাও নি। দিলে যে কি হতো সে কল্পনার স্বর্গ আমার কল্পনাতেই রয়ে গেল। এ রকম ভাবে তোমায় আমি চাইনি তনিমা—এতে তোমার সুখ নেই, আমার সুখ সেই।

তনিমা চুপ করে রইলো।

একটু পরে অলক বললে—তোমায় বলছি তনিমা, কুমারকে এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে আমি দেবোই।

তনিমার বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে উঠল। বললে—ছি, সামান্য একটা নারীর জন্যে তুমি খুন করবে? তার চেয়ে আমাকেই খুন করো, ঝামেলা সব চুকে যাক্!

অলক বললে—আজ অন্য কেউ হলে তাই বোধ হয় করতো তনিমা। রাগের মাথায় আমারও একবার সেই কথাই মনে পরেছিল, কিন্তু যাক, ভগবান আমায় রক্ষা করেছেন।

—ভগবান রক্ষা করেছেন!

—তা নয় ত কি? তোমায় যদি আমি নিজের হাতে মেরে ফেলতাম, তা অবশ্য পারব না, সে-কথা ভাবতেও আমার কষ্ট হচ্ছে—তাহলে কি হতো জানো?

—না।

—কাল থেকে যতদিন বাঁচতাম ততদিন প্রতি মুহূর্তে শুধু তোমার এই মুখখানি আমার মনে পড়তো, আর তাই ভেবে-ভেবে আমি নির্জনে বসে কাঁদতাম। ভাবতাম বেঁচে থাকলে তুমি একদিন আমায় ভালবাসতেও পার।

তনিমা চুপ করে রইলো।

অলক বললে—ঘুমোও—এবার আমার ঘুম পাচ্ছে।

দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লো একটু পরে।

পরদিন সকাল।

জানলার পথে রোদ এসে বিছানায় পড়েছে। তারই উত্তাপ গায়ে লাগতেই তনিমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখল বিছানায় সে একা।

অলক উঠে গেছে।

ধড়মড় করে উঠে গায়ে ভাল করে কাপড় জড়িয়ে তনিমা খাট থেকে নামতেই দেখল, টেবিলের উপর পিস্তলটা নেই। ঘরের দরজা খোলা। তারপর দেখল অলকের জুতোও নেই।

তবে কি পিস্তল নিয়েই সে বেরিয়ে গেছে!

ছি ছি, সেটা ত গত রাত্রে অনায়াসেই লুকিয়ে রাখতে পারত! তনিমার মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে হলো।

তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে এসে তনিমা ডাকলো চাকরকে। বললে, বাবু কোথায় গেল রে?

চাকরটা বললে—বাবু গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল মা-জী!

—তুই চট্ করে একটা ট্যাক্সি ডেকে দে আমাকে। যা—দৌড়ে যা এখুনি।

চাকরটা ছুটে বেরিয়ে গেল।

তনিমা জামা গায়ে দিয়ে চটি পরে নেমে এলো। ট্যাক্সি আসতেই তাতে চড়ে বসে বললে—চলো সিধা!

কুমার থাকত তার এক বন্ধুর বাড়ি।

সেখানে পৌঁছে তনিমা দেখল কুমার নেই—তার বন্ধুও নেই।

একটা চাকর এসে বললে—কুমারবাবু আজ সকালে চলে গেছেন। যাবার আগে একটি চিঠি দিয়ে গেছেন আপনার নামে।

—কই দেখি।

—এই নিন। বলে একটা ভাঁজ করা কাগজ দিল তার হাতে।

—আজ সকালে এক বাবু এসেছিল তার খোঁজে?

—না, কেউ আসেনি।

—আচ্ছা।

তনিমা চিঠিখানা পড়ে দেখল, তাতে লেখা—

তনিমা, বিদায় একা তোমার কাছ থেকে নয়—সমস্ত নারীজাতির কাছ থেকে। জীবনে বোধ হয় আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। তোমার কাছ থেকে আমি পালিয়ে বাঁচলাম।

তোমাকে আমি চিনতাম। চিনতাম তোমাদের জাতিকে (নারী মাত্রেই তোমার জাতি নয়) তোমরা স্বতন্ত্র।

তোমার মত আরো দুটি নারী নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত দিয়ে আমাকে সুযোগ দিয়ে দিল তোমাদের চেনবার। তখন আমি ভেবেছিলাম এরপরে এ ভুল কোন দিনই করব না আর। কিন্তু তোমার মোহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করতে পারি নি। হয়ত দূর থেকে দেখে ফিরে আসতাম। তাও তুমি দিলে না। পুরুষের সর্বনাশ করতে উন্মুখ তোমার মন আমারও সর্বনাশ করে ছাড়লো।

আমি জানি তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই আমাকেও তুমি একদিন চরম অপমান করে আমাকে দূরে ফেলে দেবে। নতুনের সন্ধানে ছুটতে তুমি কুণ্ঠিত হবে না। তোমার কাছ থেকে ও অবহেলা পাবার আগেই বিদায় নিলাম।

তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। বিধাতা অকাতরে তোমার উপরে তার রূপ, যৌবন, বুদ্ধি সব দান করেছেন, কিন্তু তবু তুমি কেন হীন কদর্য ব্যাধি সঞ্চয় করে ফিরবে ? তোমার মহিম-ময়ী নারীত্বকে জাগিয়ে তুমি কি জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করতে চাও না ? কিন্তু তুমি যে পথে চলেছ তার শোচনীয় পরিণাম ভেবে দেখো। রূপ যৌবন মানুষের চিরকাল থাকে না। তোমারও একদিন তা থাকবে না। অথচ তুমি থাকবে। সেদিন তুমি আত্মহত্যা করতে না পার ত কি নিয়ে তুমি বাঁচবে ? এম্‌নি বহু দুঃখিনী অভাগিনীর শোচনীয় পরিণাম আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

এখনও সময় আছে, এখনও তুমি নিজেকে একবার চেনবার চেষ্টা করো। আমার সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র দেহের অতি ক্ষুদ্র পরিধির চারদিকে

মাথা ঠুকে তোমার সুখের সন্ধান করো না। সে সন্ধান তোমার ব্যর্থ হবে।

আমিও একদিন তোমার মতই অন্ধের জীবন যাপন করেছিলাম, বিধাতা দয়া করে আমাকে সে-পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন।

সন্ধ্যাবেলা যখন ঠিক চোরের মত ভয়ে-ভয়ে পালিয়ে আসছিলাম, পথে বেচারা অলক আমার হাত চেপে ধরল। এর আগে দৃষ্টি-শক্তি আমার এমন আচ্ছন্ন ছিল যে তার দিকে ভাল করে তাকাবার অবকাশ পাইনি। আজ দেখলাম—তোমার বিষক্রিয়ায় তার সারা দেহমন জর্জরিত। সজল দুটি চোখে যে অভিশাপ প্রত্যক্ষ করলাম, তাকে অস্বীকার করবার সামর্থ্য আমার কোথায়? তার সে অভিশাপ, তুমি কি মনে কর—আমায় স্পর্শ করবে না? তোমাকেও না?

অলককে তোমার ভাল না লাগে, তাকে তুমি তোমার সর্ব দেহ-মন দিয়ে গ্রহণ করতে না পার পরিষ্কার সে কথা তার কাছে স্বীকার করে, তাকে বুঝিয়ে তোমাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন করে অন্যত্র চলে যাও। যেখানে তুমি আত্মস্থ হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, সেখানে তুমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করো। তা যদি সম্ভব না হয় ত অলককে তোমার দেহমন সর্বস্ব সমর্পণ করে প্রায়শ্চিত্ত করো।

সন্ধ্যার অন্ধকারে তাকে আমি রাস্তার উপরে ঠেলে ফেলে দিয়ে এসেছিলাম সেজন্যে আমার অনুশোচনার অন্ত নেই। তাকে দেখে আমার মনে হয়েছে, সে তোমাকে ভালবাসে। তাকে প্রত্যাখ্যান করো না।

বিদায় বন্ধু। যেখানেই থাকি তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করব।

ইতি— তোমার বন্ধু কুমার

চিঠিখানা শেষ হলে দেখা গেল, তনিমার দুটি চোখ জলে ভরে এসেছে। দরজার কাছে যে চাকরটা দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে খেয়াল নেই। কাপরের আঁচলে চোখ মুছে সে গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

গাড়ি চলল পুরোনো বাড়ির দিকে।

তনিমার নির্দেশমত দেখতে-দেখতে গাড়ি দরজায় দাঁড়াল। অলক

তখনও আসেনি। তবে কি সে অন্ধের মত কুমারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ?

নিচে গণপতির ঘরে কেউ নেই।

সিঁড়ির শেষ ধাপে গিয়ে দোতলার রান্নাঘরের সুমুখে ছোট্ট ছাদটুকুর ওপর যে দৃশ্য তনিমার নজরে পড়লো, তাতে সে চোখ ফেরাতে পারলো না। দেখলে গণপতি তার টুকটুকে ফর্সা ছেলেটিকে বুকে নিয়ে পায়চারি করে করে ইংরাজী শেখাচ্ছে। বলছে, মাথার ইংরাজী কি বল দেখি ? হেড্। পায়ের ইংরাজী লেগ।

ছ সাত মাসের শিশু কিছু বলতে পারছে না। সে শুধু তার সুন্দর কচি-কচি হাতদুটি নেড়ে নির্বাক বিস্ময়ে পিতার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করে খিল্ খিল্ করে হাসছে।

গণপতি বললে—শিখবিনে ?

সে আরও হাসতে লাগলো।

গণপতি বললে—ওগো বীণা, ছেলে তোমার ইংরেজী শিখবে না বলছে। ছেলে নিয়ে যাও, নইলে এই দিলাম নামিয়ে।

—হ্যাঁ-গা, রান্না করতে-করতে তোমার ছেলেকে কি করে নিই বল ত!

বলে সেই সীমন্তিনী জননীমূর্তি দরজায় এসে দাঁড়ালো, তাকে যে আর চেনাই যায় না! সদ্য স্নান করে পিঠে একপিঠ চুল এলিয়ে দিয়েছে। ঘনঘোর অগ্নি বর্ণের লাল পাড় শাড়ি পরেছে। সর্বাঙ্গে একটি কমনীয় প্রদীপ্ত শান্ত যৌবনশ্রী।

এই কি তাদের সেই বীণা ? কামিনী বাড়িউলীর আস্তানা থেকে টেনে এনে দয়া করে যাকে এই সংসারে সে স্থান দিয়েছে—সেই বীণা! বীণাকে যেন আর বীণা বলে চেনবার উপায় নেই!

বীণা ঘর থেকে তাকে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু মুখ না দেখে চিনতে পারেনি। বললে—ও কে দাঁড়িয়ে গো, ছাখ ত!

তনিমা মুখ তুলে চাইতেই সে ছুটে এলো—কে ? তনিমা ? ওমা! আয় ভাই আয়। আমি বলি, কে দাঁড়িয়ে আছে।

তনিমা বললে—শরীরটা বড় খারাপ ভাই।

বলে তার ঘরে গিয়ে শূন্য বিছানার উপরে শুয়ে পড়লো।

—কই দেখি, কি হয়েছে?

বলে বীণা ঘরে গিয়ে দেখে তনিমা কান্নার আবেগে ভেঙে-ভেঙে পড়ছে।

বীণা বললে—কাঁদছিস কেন রে! কি হয়েছে?

—আজ আমার বড় কাঁদতে ইচ্ছে করছে। বলে সে বীণার পা দুটি জড়িয়ে ধরে আরও জোরে-জোরে কাঁদতে লাগলো।

এমন সময় বাইরে পাওয়া গেল অলকের গলার আওয়াজ।

গম্ভীর মুখে অলক ঘরে ঢুকলো। বীণা তখন ঘোমটা টেনে একটু সরে দাঁড়ালো।

বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে তনিমা কাঁদছিল। মুখ তুলে তনিমা একবার তাকিয়েও দেখল না। জুতোর শব্দে অনুভব করলো যে স্বামী তার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

তেমনি শুয়ে-শুয়েই কুমারের চিঠিখানি সে তার জামার নিচে হাত ঢুকিয়ে বের করলো। চিঠিসমেত কম্পিত হাতখানি সে আজ এতদিন পরে অসঙ্কোচে তার স্বামীর দিকে বাড়িয়ে দিলো।

হেঁট হয়ে চিঠিখানি তুলে নিতে গিয়ে অলক দেখল—তার প্রিয়তমা তনিমার প্রসারিত হস্তের চম্পক অঙ্গুলগুলি ভাষাহীন আত্মনিবেদনের মৌন ইঙ্গিতের মত থর থর করে তখনও কাঁপছে।

——